শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সুহৃদ্বরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

বনবিবির উপাখ্যান

সন্ন্যাসী বাওয়ালী

নদীর সঙ্গে দেখা

নিশীথ ফেরি

কলকাতা কলকাতা

ভালোবেসেছিলাম

একালের বাংলা গল্প

অসতী

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা ৭০০০৭৩

অসতী

চারপাশ ফর্সা হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই পাখিসব ডেকে ওঠে। কাক চড়ুই তিতির হরিয়াল বুলবুলি—হাজার রকমের পাখি। কোনটা যে কার ডাক আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না। পুকুরের পশ্চিম পারে আদ্যিকালের একটা কবরখানা, সেখানে বেশ কিছু কৃষ্ণচূড়া, নিম আর বাবলার জঙ্গল। পুবপারে জবরদখল কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনি। কলোনির দিকেও আগে জম্পেশ জঙ্গল ছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে শেয়াল ঘুরত। এখন সে সব উৎখাত হয়ে লোকালয় বসেছে। এখন আর বোঝার উপায় নেই, এই কলোনির দিকে আগে কেমন স্যাঁতসেঁতে জলা ছিল।

প্রীতিলতা চোখ মেলে তাকালেন, চৌকির চারপাশে মশারিটা গোঁজা রয়েছে। কিন্তু এ কলোনিতে মশারি টানিয়েও রেহাই নেই। বিনবিন করে সারারাত মশা। কে জানে, মশার জ্বালাতনেই ওঁর ঘুম ভাঙল, না পাখির ডাকে। যে জন্যই ভাঙুক প্রীতিলতা আপাতত আলস্য জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে পাখির ডাকই শুনতে লাগলেন।

সারাদিন পাখিগুলোর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। হাজার ঝামেলার মধ্যে পাখি ডাকছে কি ডাকছে না, কেই বা অত মাথা ঘামায়। অথচ এখন মনে হল, বাইরে যেন পাখিগুলোর মহোৎসব লেগেছে।

চারপাশে আরো একবার চোখ বুলিয়ে ঘরের অন্ধকারটা ঠাহর করার চেষ্টা করলেন প্রীতিলতা। কিন্তু না, সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট। ঘরের মাঝখানে দাপনার বেড়া দিয়ে একটা পার্টিশন। পার্টিশনের

ওপাশে তুলুর এখন মাঝরাত। ওকে ডাকতে ডাকতে বেলা ন'টা বেজে যাবে, তবে যদি ও ওঠে। গতকাল রাতে তুলুর মশারিটা টানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিনা মনে করতে পারলেন না প্রীতিলতা। ক'দিন ধরে যা অবস্থা চলেছে, তাতে মাথা ঠিক রাখাই কঠিন। তা ছাড়া ওসব কাজ বউমারই করার কথা. কিন্তু শ্রীমতী যে হুট করে এ সময় বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে কে জানত! যাবার আগে একবার শাশুড়ীর অনুমতি নেওয়াও প্রয়োজন মনে করল না। রাগে দুঃখে প্রীতিলতা কেমন ভেঙে পড়েন। কিন্তু ক্ষোভটা বেশি করে তুলুর ওপরই জমা হয় ওঁর। তুলুর আস্কারা না পেলে এমন হয় কখনো! অসম্ভব।

হঠাৎ সারা গা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। বাঘাটা লাফাতে লাফাতে উঠোনের উপর দিয়ে ছুটে গেল। কে জানে, কিছু হয়তো দেখেছে। দেখার কি আর শেষ আছে!

মাস খানেক আগে ঐ কবরখানার দিকে কলোনির জগদীশকে কারা খুন করে ফেলে রেখে গেল। তাই নিয়ে কত হুজ্জুতি। পাড়ার ছেলেরা সব গা ঢাকা দিল বেপাড়ায়। অবশ্য তুলুকে নিয়ে প্রীতিলতার এসব ঝামেলা নেই। কপালগুণে তুলুকে এখন থানার অনেকেই চেনে।

প্রীতিলতার মনে পড়ল জগদীশ যে দিন খুন হয়, সে দিন ঐ কুকুরটা সারারাত উঠোনের ওপর ছুটোছুটি করেছে, চেঁচিয়েছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল। পুকুরের এপার থেকে ওপারে কি ঘটছে তা হয়তো ঐ রাতে স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু বাঘা যেন ঘ্রাণেই বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ঘটছে। সকালে কলোনির মধ্যে পুলিস ঢুকতেই বোঝা গেল কুকুরের চেঁচানিটা বৃথা নয়।

আজও কুকুরটা চেঁচাতে চেঁচাতে লাফিয়ে পুকুরের দিকে ছুটে গেল। কোথায় গেল কে জানে! প্রীতিলতা কান পেতে থাকলেন। না, কুকুরটা যেন পুকুরের কাছে গিয়ে হারিয়ে গেল। চারপাশে আবার শুরু হয়ে গেল পাখির ডাক। অসংখ্য পাখি, হাজার হাজার পাখি।

কিন্তু কুকুরের ডাকটা কি তুলুও শুনতে পেয়েছে! যদি পেয়ে থাকে

নির্ঘাৎ ও বিছানায় কাঠ হয়ে পড়ে আছে। জগদীশ খুন হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন গুটিয়ে গেছে তুলু। সারাক্ষণ কেবল ভয়, সারাক্ষণ নিজেকে কেবল লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। কিন্তু কেন, প্রীতিলতা কিছুতেই বুঝতে পারেন না, অত ভয় কেন তুলুর! কাকে ভয়? পাড়ায় তো আরো ছেলে আছে, তারা তো দিব্যি সারাদিন আগের মতোই হেসে খেলে বেড়ায়। ভয়টা অমন করে কেবল তুলুকেই পেয়ে বসল কেন? জগদীশের সঙ্গে ওর ভাবসাব ছিল এই কি ওর দোষ! ওরা এক কলোনির ছেলে, ভাবসাব তো থাকতেই পারে। কিন্তু জগদীশের মতো তুলু তো কখনো পার্টি নিয়ে মেতে থাকে না। সে সময় কোথায় ওর! জগদীশের মতো তুলু দাঙ্গাবাজি করারও ছেলে নয়, তবে! প্রীতিলতা কিছুতেই বুঝতে পারে, না, কি কারণ হতে পারে তাহলে!

সরাসরি একদিন তুলুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হ্যাঁরে, কি হয়েছে তোর বল দেখি? অমন করছিস কেন? এই—

তুলু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কই কিছু না তো। কি করেছি?

প্রীতিলতাও ছাড়বার পাত্রী নন, তা হলে অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? মনে করেছিস, আমি কিছু বুঝি না, না?

—মনমরা! তুলু অবাকচোখে তাকিয়েছিল, না তো! তারপর হেসে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিছু না। তেমন কিছু হলে তোমার কাছে লুকোব কেন। বিশ্বাস কর, কিছু না।

কী জানি কেমন যেন রহস্যে পড়ে যান প্রীতিলতা। কিছু যদি নাই হবে, তাহলে খাওয়া বসা শোওয়া সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে কেন ওর! জন্ম থেকে তুলুকে মানুষ করেছেন প্রীতিলতা, ওকে উনি বুঝবেন না তো কে বুঝবে!

বউমার সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছিলেন একদিন, কিন্তু যেমন দেবা তেমনি দেবী।

—ও বউমা, তুমিও কি চোখ বুজে থাকবে?

আরতি কথার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়িয়েছিল. আমি কি করব !

—বারে, ছেলেটা খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে !

—কিভাবে দেখব ? আমি তো কত বলি, আমার কথা শোনে না।

প্রীতিলতা কেমন সন্দেহের চোখে তাকান, দিন রাত তো ঘরে বসে ফুসুর ফুসুর কর। নেহাত এ বুড়ি জানতে চেয়েছে, তাই অত ন্যাকামি। বলতে ইচ্ছে হল, এ সংসারে সবাই ভাত টিপে খায় বৌমা। কিন্তু প্রীতিলতা নিজেকে সামলে নিলেন, তোমায় কিছুই বলে না ?

আরতি শুকনো মুখে তাকিয়েছিল, আপনাকেও যা বলে, আমাকেও তাই। আমি কি করব বলুন না ? কার সঙ্গে ওর কি ব্যাপার তা আমি কি করে জানব।

প্রীতিলতা আবার কিছুক্ষণ থমকে রইলেন, তুমি রাগ করো না বউমা। তোমরা তো মাঝে মাঝে সিনেমা বাইস্কোপও যেতে পার। ছেলেকে তোমার হাতে দিয়েছি, ওর ভালমন্দ তুমি দেখবে না তো কে দেখবে। তোমাদের বাপু ব্যাপারই বুঝি না।

—ঠিক আছে, ওকে বলে দেখব। আরতি সরে গিয়েছিল সেদিন।

এরপর গত শনিবার, প্রীতিলতা হিসেব করলেন, শনি রবি সোম তিন তিনটে দিন পার হয়ে গেছে, আজ মঙ্গলবার। শনিবার বিকেলে তুলু আর আরতি সাজগোজ করে বেরিয়ে গেল। সিনেমা দেখতে যাওয়ার নাম করেই বেরুল। প্রীতিলতা খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু রাত ক্রমশ গভীর হতে শুরু করলে কেমন দুশ্চিন্তায় পড়লেন উনি। সিনেমা কী সারারাত ধরে হয় ! কী জানি বাপু, ওদের কোন ধরনধারণই বোঝা যায় না।

দূরে টিন কারখানায় যখন বারোটা বাজার সংকেত পড়ল, তখন প্রীতিলতা ঘরবার শুরু করে দিলেন, কী হল রে বাবা, কোন বিপদ আপদ ঘটল না তো ! রাস্তাঘাটে এত গাড়ি ঘোড়া, গাড়ি চাপা পড়ল না তো ! মাগো ও সব ভাবতেই কেমন গা শিউড়ে ওঠে।

অবশেষে রাত যখন প্রায় একটা, তখন টলতে টলতে বাড়ি ফিরল ছলু, একা। সে কী চেহারা, জামা-কাপড় কাদা মাখা, ছেঁড়া, চোখের নিচে রক্ত জমে ট্যাম হয়ে উঠেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ছলু।

প্রীতিলতা ছেলের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, কি হয়েছে ? অ্যাঁ, কি হয়েছে ছলু ? বউমা কোথায় ?

ছলুর ছ'চোখে তখনো ত্রাস কাটে নি। দরজায় পিঠ লাগিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়েছিল, জল, আগে জল দাও। আর অত জোরে ষাঁড়ের মতো চেঁচিও না, চুপ করো।

—চেঁচাব না, বলে কী ! প্রীতিলতা তড়িঘড়ি জল নিয়ে এলেন। কোথায় গিয়েছিলি তোরা ? আমার কি হবে গো, ঐ ডাইনীটাকে কোথায় রেখে এলি ?

—আহ্। বলছি না চেঁচিও না। ছলু দরজায় খিল তুলে দিল। বড় জোর প্রাণে বেঁচে গেছি আজ। নেহাত পরমায়ু ছিল তাই।

প্রীতিলতা কেমন খেই হারিয়ে ফেললেন, তোরা সিনেমা যাস নি ?

—যাব না কেন, গিয়েছিলাম। শো ভাঙার পর আরতিকে বেলে-ঘাটা পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলাম।

—বেলেঘাটা ! কেন ? বেলেঘাটা শোনামাত্রই সারা গা জ্বলে উঠল প্রীতিলতার। বেলেঘাটাতেই আরতির বাপের বাড়ি। গলায় বিষ ঝরিয়ে বললেন, কার কথাতে তুই ওকে বেলেঘাটা নিয়ে গেলি ?

—আহ্ শোন না। ছলু বোঝাবার চেষ্টা করল, অনেক দিন ধরেই ও যাবো যাবো করছিল, তাই ভাবলাম ছ'এক দিনের জন্য ওকে রেখে আসি। ওখান থেকে বেরুতে একটু রাতও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা যে আমাকে খাল ধারে আক্রমণ করবে, আমি বুঝতেই পারি নি। আমার মনে হল ওরা আমাকে বেশ কয়েকদিন ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

—খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কারা ওরা ?

—সত্যি বলছি মা, কালীর নামে দিব্যি করে বলছি, আমি চিনি

না। কিন্তু মনে হল, ওরা আমাকে চেনে। ওরা আমার হাঁড়ির খবর রাখে।

—কি চায় ওরা? প্রীতিলতার মুখখানি কেমন যেন রক্তশূন্য হয়ে উঠেছিল।

—ওরা আমাকে খুন করতে চায়। আমার মনে হল, জগদীশকে ওরাই খুন করেছে। ওদের হাতে লাঠি ছোরা পাইপগান—

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রে। প্রীতিলতা ডুকরে উঠলেন। পায়ের নিচে মাটি কেমন যেন কাঁপতে শুরু করেছিল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন প্রীতিলতা, ওরা কারা?

—সত্যি বলছি মা, চিনি না। কিন্তু আমি কোথায় যাই, কি করি, সব ওরা খবর রাখে।

—তুই কোথায় যাস তুলু? কি করিস তুই? আবার আর্তনাদ করে উঠলেন প্রীতিলতা।

—আহ্ চেঁচিও না। বলছি না চেঁচাবে না। এসব ব্যাপারে জানাজানি না হওয়াই ভালো।

প্রীতিলতা তুলুর চোখের গভীরে তাকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু না, কেমন দুর্বোধ্য। নিজেরই পেটের ছেলে এখন অনেক দূরের মানুষ। কি জানি কোন সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়ে বসে আছে তুলু।

শিয়রের কাছে লোহার শিক লাগানো জানলাটার দিকে তাকালেন প্রীতিলতা। ওটা বন্ধই রয়েছে। আগে খোলা রাখা হত। কিন্তু শনিবারের ঐ ঘটনার পর দরজা-জানলা বন্ধ না রেখে উপায় নেই। তুলুর সারাক্ষণ ভয়, এই বুঝি কেউ জানলার ধারে ঘাপটি মেরে বসে ওদের কথা শুনছে। এমন সম্ভাবনার কথা প্রীতিলতাও এখন আর উড়িয়ে দিতে পারেন না। তবু মনে হয়, তুলু একটু বাড়াবাড়িই করছে। অনেকভাবে তুলুর মন থেকে ভয় মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন প্রীতিলতা কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অফিস যাওয়াও বন্ধ করেছে তুলু। সারাদিন কেবল ঘর বন্দী। সারাদিন একা ঘরে শুয়ে শুয়ে কী যে ও ভাবে, কে জানে!

আরতির ওপরই উষ্মাটা ধীরে ধীরে জমে ওঠে প্রীতিলতার। এমন দুর্দিনে বউমা যে বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে এটাই বা কী কথা! তাই গতকাল বউমাকে নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন প্রীতিলতা, বউমাকে আনিয়ে নিলে হয় না?

তড়াক করে বিছানায় লাফিয়ে উঠেছিল তুলু, না, ওসব করতে যেও না। যখন প্রয়োজন হবে আমিই নিয়ে আসব।

প্রীতিলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, আমি তো ভেবেছিলাম, শম্ভুকে একবার পাঠিয়ে দেব। তুই বেরুতে ভয় পাচ্ছিস, শম্ভুকেই বরং বলে দেখি।

—কে শম্ভু?

—শম্ভুরে শম্ভু। নন্দীবাবুর ছেলে।

তুলু বুঝল, কলোনিরই ছেলে শম্ভু। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত মুখ বিকৃত করে উঠেছিল, না, খবরদার না। যখন আনতে হবে আমিই গিয়ে নিয়ে আসব। ওসব শম্ভুটম্ভু না।

—তা হলে তুই-ই যা, নিয়ে আয়।

—যখন আনতে হবে, ঠিক নিয়ে আসব। এখন না, তাছাড়া ওসব নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না।

প্রীতিলতা কিছুক্ষণ থমকে থেকে শুধোলেন, হ্যাঁরে বউমার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয় নি তো?

—আহ্, বলছি তো এখন যাও। সব সময় ঘ্যানঘ্যান ভাল্লাগে না।

—ঘ্যানঘ্যান! আমি ঘ্যানঘ্যান করি! প্রীতিলতা আবার তেতে উঠেছিলেন, ওরে আমার পেটের শত্তুর, এখন তো ওসব কথাই বলবি। এখন বউয়ের কথায় উঠবি, বসবি। এখন আর আমি কে?

—আহ্, থামো না। ফুঁসে উঠেছিল তুলু, তুমি কি বলো তো। চারপাশে এতসব ঘটছে, তুমি কি কিছুই বোঝ না?'

—চারপাশে সবাই তোর মতো ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকে কি না!

—সাবধানের মার নেই বলেই ওগুলো বন্ধ রাখতে বলি। দিনকাল খারাপ বলেই, নইলে আর আমার কী।

—দিনকাল শুধু তোদেরই খারাপ হয়ে গেল। কই আগে তো ওসব বলিস নি?

—আগে বলি নি, প্রয়োজন হয় নি।

—প্রয়োজন হয় নি। তা হবে কেন! এখন পরামর্শ দেবার লোক এসেছে, এখন আর প্রয়োজন হবে কেন!

প্রীতিলতা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেন নি। ছেলের উপর এতকালের মায়ের অধিকার, সব নিমেষে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মাত্র বছর দেড়েক হল. কত সাধ করে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন প্রীতিলতা। বিয়ের সময় লাল বেনারসী পরা আরতিকে দেখে মনে হয়েছিল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বুক ভরে গিয়েছিল প্রীতিলতার। কেবল ঢুলুর বাবাই বউ দেখে যেতে পারলেন না, এই যা দুঃখ। তা ছাড়া আর কী চাই, মনেপ্রাণে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন উনি, ওরা সুখী হোক. ওরা সংসার বাড়িয়ে ঘরখানাকে ঝলমল করে তুলুক। আর কী চাই, আমি আর ক'দিন।

কিন্তু কয়েকটা মাস যেতে না যেতেই প্রীতিলতা বুঝতে পারলেন, ঘরে শ্রীলক্ষ্মীর বদলে একটা ডাইনী ঢুকেছে। প্রীতিলতাও তো একদিন নববধূ সেজে শ্বশুর কুলে গিয়েছিলেন, শ্বশুর শাশুড়ীকে কিভাবে সেবা করতে হয়, কেউ তো ওকে শিখিয়ে দেয় নি। ও সব মেয়েরা আপনি আপনি শিখে নেয়। কিন্তু আরতি যেন সৃষ্টিছাড়া। বাইরেটাই ওর চকমকে, ভিতরে থিকথিক করছে বিষ। সাতকুলেও এমনটি কোনদিন দেখেন নি প্রীতিলতা। হে ভগবান, তোমার মনে এ কী ছিল গো! ছেলেটাকে আমি কি সত্যি সত্যি একটা ডাইনীর হাতে তুলে দিলাম। দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল প্রীতিলতার। কুল কুল করে বুকের ভেতরটা উথলে উঠেছিল। প্রীতিলতা আর কান্না চেপে রাখতে পারেন নি সে সময়।

মাথার কাছে জানলাটা খোলা থাকলে বাইরে আলো ফুটেছে কিনা দেখতে পেতেন। কুকুরটা সেই যে একবার চেঁচিয়ে উঠে পুকুরের ধারে গেল, তারপর কি! কোথায় গেল! সত্যি সত্যি কি কিছু দেখল! নাহ্. ওর আর সাড়াশব্দই নেই। বরং পাখির ডাক যেন আরো বেড়েছে। মনে হল, বাড়ির চালেই যেন কাক বসেছে। বাড়ির চালে কাক বসা খারাপ। গাটা কেমন শিরশির করে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। প্রীতিলতা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলেন।

জানলার ওপাশে একটা নিমগাছ রয়েছে। গাছটাকে নিজের হাতেই কুড়িয়ে এনে ওখানে লাগিয়েছিলেন প্রীতিলতা। নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু গাছটাকে কিছুতেই বাড়-বাড়ন্ত করে তুলতে পারেন নি। গাছটার ডাল ভেঙে পাতা ছিঁড়ে সারাদিন জ্বালাতন করে কলোনির উচ্চিংড়েগুলো। এই নিয়ে ঝগড়া করে করে গলা ব্যথা হয়ে গেছে। এখন আর ও সব নিয়ে মাথা ঘামান না উনি। গাছ তো সামান্য একটা ব্যাপার; বাড়ির চৌহদ্দি ঠিক করার সময় কী কম ধকল গেছে ওঁদের। চারপাশে বেড়া তুলতে গিয়ে কী কম হুজ্জুতি! অবশেষে কোনরকমে তা হয়েছে। একদিকে পড়েছে পুকুরটা। এতে বেশ সুবিধাই হয়েছে। কলোনির টিউবকল থেকে খাবার জলটুকু এনে নিলে বাকি কাজ পুকুরের জলেই সারা যায়। পুকুরের গায়ে তিনটে শাল খুঁটি পেতে একটা ঘাট মতোও করে নেওয়া হয়েছে।

আর বাড়ি বলতে কোনরকমে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই। চার-পাশে চুন সুরকির গাঁথনি দেওয়া ইঁটের দেওয়াল। উপরে টিনের চাল। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, ওটা ঢালাই ছাদ কিনা। তুলুকে বিয়ে দেওয়ার আগে ও ঘরেই চলে যেত; বিয়ের পর ঘরের মাঝখানে একটা পার্টিশন তুলতে হয়েছে। দাপনার বেড়ার পার্টিশন। ভবিষ্যতে ঐ পার্টিশনটা ইঁটের করে দিয়ে মাঝখানে একটা দরজা বসানোর কথা ভাবা আছে। তুলু বেঁচে থাকলে সবই হবে। কপালে থাকলে সবই হবে।

প্রীতিলতার মনে পড়ে, সাতচল্লিশে পাকিস্তান হল, উনপঞ্চাশে ওরা চলে এল কলকাতায়। দুলু তখন অনেক ছোট। মায়ের আঁচল ধরে ধরে বড় হচ্ছে। ওর বাবাই কীভাবে যেন এই জায়গাটার হদিশ পেলেন। রাতারাতি দাপনার বেড়া দিয়ে ঘর বানিয়ে ফেলা হয়েছিল এখানেই। তখন ভুলেও কেউ এদিকে এগোত না। যেমন ছিল জঙ্গল, তেমনি জলা।

কিন্তু দিনে দিনে এ জায়গাই কেমন দামী হয়ে উঠল। শোনা যাচ্ছে, গড়িয়ার দিক থেকে একটা বিশাল রাস্তা বেরিয়ে এই কাটা-পুকুর কলোনির পাশ দিয়ে চলে যাবে। তখন এই পুকুরের পাশের নিচু জমিরই দাম হবে দশ হাজার, বিশ হাজার।

প্রীতিলতার মনে পড়ে, দুলু একদিন ঝালমুড়ি চিবোতে চিবোতে বলেছিল, জান মা, পাঁচটা বছর যদি টিকে থাকতে পারি তা হলেই আমার হয়ে যাব।

—ওমা, ও কি কথা? কি হয়ে যাবে?

—তুমি যা চাও!

—কি চাই?

—বাড়ি গো বাড়ি। একটা দোতলা বাড়ির টাকা পাঁচ বছর হলেই আমি জমিয়ে ফেলব। তুমি দেখে নিও। তোমাকে অবশ্য বলতে ভয় লাগে, তুমি যা পেট-পাতলা মানুষ।

—আমি পেট পাতলা মানুষ! কেন কি বলেছি কাকে?

—বল নি, আমার সঙ্গে থানার যোগাযোগ আছে, ওদের সঙ্গে আমার গলায় গলায় খাতির, এসব কথা কে বলে শুনি?

—কেন? কি হয়েছে বললে?

—এই জন্যই বলি মা, এই শহরটাকে এখনো তুমি যশোর বলেই ভাবছ, যশোর আর কলকাতা কখনো এক হতে পারে না। যশোর ছিল নরম মাটি দিয়ে তৈরি, আর কলকাতা গোটাটাই পাথরের। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার সব আলাদা।

—বেশ তো, ওসব বললে যদি দোষ হয় বলব না।

—হ্যাঁ, বোলো না। তা ছাড়া আরতির কাছেও আমাদের অনেক কথা বলা উচিত নয়, অথচ কিছুই তোমার মুখে আটকায় না।

প্রীতিলতা বিস্মিত হয়েছিলেন, আরতি তো ঘরের বউ, ওর কাছেও গোপন করে চলতে হবে।

গোপন করব কেন! তবে কিছু কিছু কথা আছে যেটা আগ বাড়িয়ে না বলাই উচিত। সময় হলে ও নিজেই সব জেনে যাবে।

প্রীতিলতা বুঝতে পারছিলেন না, কী এমন গোপন কথা উনি আরতির কাছে বলে ফেলেছেন। তবে কী বিমানবাবুর স্ত্রীর সেই পাথর বসানো হারটার কথাই বলতে চাইছিল দুলু। কিন্তু ঐ হার তো এখন ওদেরই হয়ে গেছে। বিমানবাবু ঐ হার বন্ধক রেখে পাঁচশ টাকা নিয়েছিলেন ওদের কাছ থেকে। প্রয়োজনের সময় কেই বা অমনভাবে ঘরের টাকা বার করে দিয়ে পরের সাহায্য করতে পারে। অবশ্য ওদেরই কপাল ভালো, আজ আর কেউ হারটার দাবিদার নাই। বিমানবাবু বছর তিনেক আগে রেলে কাটা পড়ে মারা গেছেন। বিমানবাবু যে ঐভাবে মারা যাবেন সে দোষও কি ওদের।

দুলাল বিরক্ত হয়ে বলেছিল, আমরা হারটা কিভাবে পেয়েছি সে কথা আরতিকে বলা উচিত হয় নি তোমার। ওতে আমাদের সম্মান বাড়ে নি।

প্রীতিলতার মুখখানা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল। বন্ধকী কারবারে সম্মান নেই সবাই জানে। কিন্তু বিমানবাবুর হারখানাও তো ফেরত দেবার উপায় নেই। তাছাড়া সম্মানের কথা বলছিস, তোর বাবা সর্বস্ব খুইয়ে যখন এখানে এসে হাজির হলেন, তখন ঐ বন্ধকী কারবার শুরু করেছিলেন বলেই আজ তোরা বেঁচে আছিস। কোথায় থাকত তোদের এই সম্মান?

দুলু থামে নি। বলেছিল, নতুন বউকে তোমাদের গুণকীর্তন কি না শোনালেই নয়?

—গুণকীর্তন কী কথা! হারটা বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে, ওটা তো আরতিই পরবে। তাই ও যখন দেখতে চাইল, দেখালাম।

—আরতি কিন্তু ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে নি।

—কেন, কিছু বলেছে ?

—বলাবলির কি আছে। শত হলেও ও নতুন এসেছে এ বাড়িতে। তুমি বুঝতে পার না, এসেই এসব কথা শুনলে মনের অবস্থা কি হয়!

প্রীতিলতা আজকাল অনেক কিছুই বুঝতে পারেন না। জগৎ সংসার সব কিছুই এখন কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। আগের সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। এখন ছেলে বিশ্বাস করে না মাকে। স্ত্রী বিশ্বাস করে না স্বামীকে। এখন একটা অবিশ্বাসের যুগ। এ যুগের সঙ্গে সত্যি সত্যি বড় বেমানান লাগে নিজেকে। বড় অসহায় লাগে প্রীতিলতার।

নাহ্, পাখিগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে। টিনের চালের ওপর ঝগড়া করতে করতে কয়েকটা কাক কিছুক্ষণ কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে আবার উড়ে গেল। টিনের চালের শব্দটা দুপদাপ করে বুকে বাজল। নাহ্, আর শুয়ে থাকা ঠিক নয়। প্রীতিলতা ধীরে ধীরে মশারি ফাঁক করে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ঘরের একপাশে রাখা লক্ষ্মীর আসনের দিকে ঘুরে ঠাকুর প্রণাম সেরে নিলেন। তারপর অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে দরজার দিকে এগোলেন প্রীতিলতা। দরজার খিলে হাত চেপে টান দিলেন, মাঝে মাঝে বড় বেয়াড়াভাবে আটকে থাকে খিলটা। কিন্তু না, চট করে আজ খুলে গেল।

দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন প্রীতিলতা। এক ঝলক শিশির ভেজা বাতাস ওর মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। অন্ধকারটা এখনো পুরোপুরি কাটে নি। অস্পষ্ট হলেও এখন সব কিছুই চেনা যায়। ওদিকে পুকুরের দিকে ঠাসা কচুরিপানা, ওদের ঘাটের কাছে বাঁশের ঠেকা দিয়ে সেই পানাকে আটকে রাখা হয়েছে। প্রীতিলতা দেখলেন, নিস্তব্ধ খানিকটা জল স্থির হয়ে আছে, কালো। পুকুরের ওপারে আবছা আলো-আঁধারির মধ্যে এখনো ডুবে আছে কবরখানাটা।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকলেন উনি। পরে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে একটি পা বার করে দিলেন বাইরে। আর ঠিক এই মুহূর্তেই সেই অভাবনীয় দৃশ্যটা ওঁর চোখে পড়ল।

চিৎকার করে উঠলেন প্রীতিলতা। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ওপর কে ওটা উলটে পড়ে আছে! কে ও! তারপর হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এলেন দেহটার দিকে, কে? ওমা, কে গো! অ্যাঁ, বউমা তুমি!

বউমা! হ্যাঁ বউমাই তো! কী হয়েছে! ও বউমা—

চেঁচিয়ে দাওয়ায় পড়ে থাকা আরতির রক্তাক্ত দেহটার দিকে ঝুঁকে পড়লেন প্রীতিলতা। তারপর ডাকাতপড়া চিৎকার করে উঠলেন, আমার কী হবে গো—, দুলু, দুলুরে—

॥ দুই ॥

এ চিৎকারে পড়শীদের ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। হয়তো ওপাশের মন্টিদের বাড়িতে সবাই জেগে উঠেছে। হয়তো বুলবুলরাও চিৎকারে আঁতকে উঠেছে। কিন্তু আজকাল মানুষের মতো কাপুরুষ জীব আর দ্বিতীয়টি নেই। কেউ বেরুল না, কেউ জানতে চাইল না, বুড়িটা অমন করে চেঁচিয়ে উঠেছে কেন? তবে কি ডাকাত পড়ল! তবে কি জগদীশকে যারা খুন করেছিল তারাই ও বাড়িতে হানা দিয়ে বসল! যে ঘটনাই ঘটুক, আশেপাশের বাড়ির সবাই জানে, নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রীতিলতার চিৎকারে পাড়াটা বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না।

কিন্তু ততক্ষণে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে দুলাল। দুচোখে ত্রাস, পরনের লুঙ্গিটা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে আবার সামলে নিয়ে এক লাফে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল, কি? কি হয়েছে?

তারপর বাঁকাভাবে সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা আরতির দিকে চোখ

পড়ায় দুলালের মনে হল, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আরতি, হ্যাঁ, আরতিই তো! কিন্তু, কখন এলো আরতি! ও কি একাই, না ঘরের ওপাশে কেউ পাইপগান নিয়ে অপেক্ষা করছে! সেই চিবুকের কাছে কাটা দাগওলা লোকটা কি!

ঘামতে শুরু করল দুলাল। দরদর করে ওর কানের পাশ দিয়ে তপ্ত ঘামের স্রোত নেমে আসছে কি! বুঝতে পারল না। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক অবসন্নভাব। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। হাঁটুদুটো আপনি আপনি ভাঁজ হয়ে ভেঙে এল। ইঁটের অমসৃণ পিলারের গায়ে দেহের ভারটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বসে পড়ল দুলাল। ততক্ষণে আরতির মাথাটাকে টেনে তুলেছেন প্রীতিলতা। বউ মা, ও বউ মা। চোখ খোল না বউ মা, তুমি অমন করছ কেন? ও বউ মা?

অতল জলের গভীর থেকে আবার যেন ভেসে উঠল দুলাল। চোখে মুখে আবার যেন ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া পাচ্ছে ও। নিজেকে আবার শক্ত করে নিতে একটুক্ষণ সময় লাগল। তারপর মায়ের দিকে তাকাল, আরতির দিকে তাকাল। আর এ সময় ওর খেয়াল হল, মা যেভাবে চিৎকার দাপাদাপি করছে, তাতে এখনই সবাই জেনে যাবে। এখনই আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। জানতে চাইবে কি হয়েছে? কেন? কেন এমন হল?

দুলাল মায়ের হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল, বলেছি না চেঁচাবে না। সরো. সরে যাও, সরো না।

মাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দুলাল। তারপরে সাপটে ধরল আরতিকে। দু হাতের উপর আরতিকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে ঘরের ভিতর চলে এল নিমেষের মধ্যে।

আরতিকে খাটের উপর আছড়ে ফেলল দুলাল। পেছনে পেছনে ধেয়ে এসেছিলেন প্রীতিলতা, আমার কী হবে গো! ও দুলু, বল্ না, কি হয়েছে ওর? কোত্থেকে এল ও! কী সর্বনেশে ডাকাতে বউ আমি ঘরে এনেছি রে! ও দুলু—

দুলাল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, তুমি থামবে, না চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে ?

প্রীতিলতাও একটু থমকে গেলেন, চেঁচাব না, বলিস কী! বলিস কি দুলু!

—না, চেঁচাবে না। খবরদার বলছি, একদম চেঁচাবে না। কিছু না বুঝে না শুনে চেঁচিয়ে তুমি আরো আমাদের বিপদ ডেকে আনছ।

প্রীতিলতা পাথরের মতো জমে গেলেন। আরতির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, আরতির শাড়িতে কি ওগুলো! ছোপ ছোপ কিছু রক্তের মতো শুকিয়ে আছে। গায়ের জামাটা বিশ্রীভাবে ছেঁড়া, ঠোঁটের নিচে আঁচড়ান ও দাগগুলো কিসের! কোথায় গিয়েছিল আরতি! কখন থেকে ও এই সিঁড়ির ধাপে এসে পড়ে আছে! কুকুরটার কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, ঐ তো ওদের বাঘা বারান্দার কোণে বসে ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাঘাটা যে তখন চেঁচিয়ে উঠেছিল, তবে কি আরতিকে দেখেই!

দুলাল বলল, একবার বাইরে গিয়ে চারপাশটা একটু দেখে এসো না মা। বেড়ার ওপাশে, পুকুরের দিকটাতেও। যাও না।

প্রীতিলতার গলা কেঁপে উঠল, কি আছে বাইরে? কি দেখব?

দুলাল আবার চারপাশে তাকাল, কিছু থাকতেও তো পারে! দেখে এসো না একবার। তবে খবরদার চেঁচাবে না বলছি। এমনিতেই অনেক চেঁচিয়েছ তুমি।

প্রীতিলতা বুঝতে পারছিলেন না, কি থাকতে পারে বাইরে। তবে কি সব কিছু জেনেশুনে দুলু ওর কাছে গোপন করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন, আমি কি সত্যি সত্যি ওদের শত্রু হয়ে গেছি! আমাকে কি ওরা বিন্দু-মাত্র বিশ্বাস করে না! হা ভগবান, কী পাপ করেছি আমি, যে—

—কি হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও না।

প্রীতিলতা আর একবার ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তাকালেন আরতির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বাঘাটা উঠে এসে পায়ের কাছে দাঁড়াল। প্রীতিলতা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। চারপাশ এখন বেশ ফর্সা।

ওদিকে পুকুরের জলে মাছেরা ফুটকুরি কাটছে। আরো দূরে পুকুরের পারে সাদা ধবধবে কয়েকটা বক বসে আছে। প্রীতিলতা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পুকুরের ওপারে সেই কবরখানা। দিনের বেলা ওদিকটা এখান থেকে যেমন দেখায় এখনো তেমনি দেখাচ্ছে। আর দশটা দিনের চেয়ে কোন রকম পৃথক বলে মনে হল না। তবু অনেকক্ষণ ধরে ওদিকেই উনি তাকিয়ে রইলেন। পৃথিবীর তাবৎ রহস্য ওদিকেই যেন লুকিয়ে রয়েছে।

কুকুরটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠোনে নামতেই প্রীতিলতা চমকে উঠলেন, কি রে?

কিন্তু না, কিছুই না। কুকুরটা আবার লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। প্রীতিলতাও উঠোনে নামলেন।

ওপাশের নিম গাছটাকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বেড়ার পাশে মন্টিদের বাড়িটা। এখনো দরজা খোলে নি ওরা। বাব্‌বা, সবাই কি মরণ ঘুম ঘুমুচ্ছে। না ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। অসম্ভব নয়, প্রীতিলতা এ কলোনির সবাইকেই হাড়ে হাড়ে চেনেন। অন্য সময় হলে এমন ভাব দেখাত, যেন পরম আত্মীয়ের চেয়েও ওরা বেশি। কিন্তু প্রয়োজনের সময় কেউ নেই।

নিমগাছটার কাছে এগিয়ে আসতেই কলোনির অনেকখানি ওর চোখে পড়ল। ওদিকে দূরে গোয়ালাদের খাটাল। সেই খাটালে জনা কয়েক লোক দেখা গেল। ওরাও কি টের পেল না, আরতি কখন এসে ঐভাবে বাড়ির উঠোনে পড়ল।

প্রীতিলতা বাড়ির পিছন দিকে একবার উঁকি দিলেন, ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটির বসানো একটা পায়খানা। পায়খানার চারপাশে জঙ্গল জমে রয়েছে। রোজই ঐ জঙ্গল গুলো পরিষ্কার করার কথা মনে

হয়, কিন্তু সময় আর জোটে না। অথচ ওগুলোকে পরিষ্কার না করলেই নয়। কখন হুট করে ঐ জঙ্গলের ভিতর থেকে সাপ বেরিয়ে পড়বে, কে জানে। বাড়ির লাগোয়া পুকুর বলে সাপের উপদ্রব যে নেই, এমন কথা বলা যায় না। এই তো মাসখানেক আগেও একটা সাপ মারল ছেলেরা। মেরে মুখটাকে থেঁতো করে দিয়েছিল। সাপের চকচকে গা দেখে শিউরে উঠেছিলেন প্রীতিলতা; ভাগ্যিস কারো সর্বনাশ করার সুযোগ পায় নি ওটা।

প্রীতিলতা আবার উঠোনের দিকেই ফিরে এলেন, হুলু ওকে কী দেখার জন্য বাইরে পাঠাল! কই কিছুই তো চোখে পড়ল না ওর! তবে কি আরতির কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বাইরে পাঠাল! অসহায়ভাবে হুলুর ঘরের দিকে তাকালেন প্রীতিলতা; দরজাটা তেমনি খোলাই রয়েছে। কিন্তু ভিতরে নিঃশব্দ। আরতির কি এখনো জ্ঞান ফেরে নি! এখনো কি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হুলু।

প্রীতিলতা আবার ঘরের দরজায় ফিরে এলেন। বাইরে থেকেই একবার হুলুর নাম ধরে ডেকে জানালেন উনি ঘরে ঢুকছেন। ঘরে ঢুকে পড়লেন প্রীতিলতা।

—পেছন দিকটা দেখে এসেছো? পায়খানার ওপাশে?

প্রীতিলতা সংক্ষেপে বললেন, হুঁ। বউমার জ্ঞান হয় নি?

হুলাল বলল, হয়েছে। একটু বিশ্রাম করতে দাও। সারারাত ঘুমুতে পারে নি, একটু ঘুমুতে দাও।

প্রীতিলতা অবাক হয়ে তাকালেন, আরতির মাথার নিচে একটা বালিশ, রক্ত লাগা কাপড়টা এখনো ওর পরনে, সেই ছেঁড়া জামাটাও পালটে নেয় নি ও। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে কাত করে রেখেছে আরতি। চোখহুটো বোজা, চোখের নিচে রাত-জাগা কালির ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

—কিছু বলল ও? প্রীতিলতা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন।

হুলাল মায়ের মুখোমুখি তাকাল, না, বলে নি। বলার সময় তো আর ফুরিয়ে যায় নি। পরে বলবে।

ত্বলুর উত্তর কেমন বেমানান লাগে প্রীতিলতার। এত বড় সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটল। অথচ এমন ভাব করছে যেন কিছুই ঘটে নি। ওর কী মতিভ্রম ঘটল! ঘরের বউ অমনভাবে একা একা বাড়িতে এসে উদয় হয়েছে অথচ তার জন্য এতটুকু বিকার নেই। প্রীতিলতা যদি তাঁর বিয়ের এক বছরের মধ্যেই অমনভাবে ওর শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হত, তা হলে ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দিতেন ওর শ্বশুর। নেহাত সে যুগ এখন পালটে গেছে। কিন্তু যতই পালটাক, ত্বলুটা কি সত্যি সত্যি ভেড়া হয়ে গেল!

স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন প্রীতিলতা। আবার ত্বলুর দিকে তাকালেন, এত ভোরে ও একা একা ঐভাবে বাড়ি ফিরল, তুই কি না এখনো মুখ বুজে থাকবি।

—মুখ বুজে থাকব কেন! ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও না। তুমি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছ।

—মিছিমিছি! প্রীতিলতা রাগে জ্বলে উঠলেন, মিছিমিছি বলছিস! তোর বাপ ঠাকুর্দার বংশে ও কালি দিল, আর তুই এখনো মিছিমিছি বলছিস! তোর ভাগ্যি ভাল, তোর বাবা এখনো বেঁচে নেই। তোর বাবাকে এ দৃশ্য দেখতে হল না।

ত্বলাল তবু শান্ত, তুমি একটু চুপ কর না মা। পরে তো তোমাকে সবই বলব। এখন যাও, চা করো দেখি, যাও। আর হ্যাঁ, আর একটা কথা, কেউ কিছু জানতে চাইলে বলো, কাল রাতে আমি ওকে বেলেঘাটা থেকে নিয়ে এসেছি।

প্রীতিলতা তবু অনড়, আর ওর কাপড়ে যে দাগগুলো, ওগুলোকে কি বলব? ওর জামাটা ওভাবে কে ছিঁড়েছে? ও যা দেখাল, ছোট-লোকের মেয়েরাও তা পারে না।

ত্বলাল চারপাশে আর একবার তাকাল, ওকে কাপড়টা পালটে নিতে বল না। আর একটা জামা পরিয়ে দাও না ওকে।

প্রীতিলতার হাতের কাছে এ সময় একটা কাটারি থাকলে তাই উনি ছুলুর দিকে ছুঁড়ে মারতেন। ছেলের সাহস কত, আমাকে বলে কিনা এই নচ্ছার মাগীকে কাপড় পরাতে! আমি কি তোদের চাকর? আমাকে কি তোরা ঝি রেখেছিস? ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে প্রীতিলতা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল ছুলু। সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন এক অবসন্ন ভাব ওকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে। কী করে ও মাকে বোঝাবে, এ ক'দিন ওদের ছুজনের জীবনে কী প্রচণ্ড এক ঝড় বয়ে গেল। নেহাতই ওদের পরমায়ু ছিল তাই ওরা আবার বেঁচে এল। আবার ওরা ছুজনেই বাড়ি ফিরে আসতে পারল। এ সব কথা মাকে বোঝানো যাবে না। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে কী এক ওলটপালট চলেছে মায়ের পক্ষে তা বোঝাও সম্ভব নয়।

অথচ মায়ের মুখ বন্ধ করে না রাখতে পারলেও ওদের উপায় নেই। ছুলাল এক পলক কান পেতে থাকল, না, মায়ের আর সাড়াশব্দ নেই। বোধহয় চা বানাতেই রান্না ঘরে ঢুকেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল ছুলাল।

তারপর আবার আরতির দিকে তাকাল। বেচারি কেমন হাঁটু ভাঁজ করে গুটিয়ে আছে। পায়ের গোড়ালিতে বেশ খানিকটা কাদা শুকিয়ে আছে। হঠাৎ মনে পড়ল, আরতির পায়ে তো চপ্পল ছিল, সেটি কোথায়! চপ্পলজোড়া কি ফেলে এসেছে! আসতেও পারে। আরতি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এই তো যথেষ্ট।

ছুলাল বিছানার কাছে এগিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ল আরতির দিকে, আরতি। এই আরতি!

আরতি এখন আর অচৈতন্য নয়। ধীরে ধীরে গায়ের ওপর শাড়ির আঁচলটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল।

ছুলাল ওর গায়ে হাত রাখল।

আরতি কোন প্রতিবাদ করল না। চোখছুটো বোজা, মুখের

চামড়ায় বেশ কিছুটা অস্থিরতার দাগ, মাথার চুলে এ ক'দিন হয়তো ও চিরুনি বোলাতে পারে নি। কেমন উস্কখুস্ক জট ধরে আছে। গায়ের জামাটা বড় বিসদৃশ ভাবে ছেঁড়া। কে ছিঁড়ল জামাটা? সেই চিবুক কাটা দাগওলা লোকটা কি! না, সেই পাতলা ছিলছিলে একমাথা ঝাঁকড়া চুলওলা লোকটা, নাকি গলা মোমের মতো একটা হাত বোমায় উড়ে যাওয়া সেই ছোকরাটা! নাকি ওদের পেছনে আরো কেউ আছে!

কিন্তু না, এ সব কথা এখন আরতিকে কিছুই জিজ্ঞেস করা যাবে না। আরতিকে আগে বিশ্রাম করতে দেওয়া দরকার। প্রাণভরে ও ঘুমিয়ে নিলে সুস্থ হবে। এ ক'দিন ওর পেটে কিছু পড়েছে কিনা তাও জানে না দুলাল।

—আরতি, তুমি কি কিছু খাবে? আরতি শুনছ? সস্নেহে আরতির গায়ে আলতো করে হাতটা বুলিয়ে দিল দুলাল।

আরতি উত্তর দিল না। মুখটাকে একপাশে ফিরিয়ে রাখল।

—ঠিক আছে তুমি ঘুমোও। ঘুমিয়ে নাও। দুলাল আরতির গা থেকে হাতটাকে তুলে নিল। পরমুহূর্তেই আরতির মাথার কাছে মুখটা নামিয়ে আনল আবার, আরতি, তোমার কাপড়ে ওগুলো কিসের দাগ! আগে ওটা পালটে নাও না আরতি। খুব খারাপ দেখাচ্ছে। প্লিজ—

আরতি তবু নিরুত্তর।

—এই আরতি, আলনায় তোমার জামা রয়েছে। জামাকাপড় পালটে তুমি ভাল করে শোও না আরতি। কেউ যদি আসে দেখে ফেলবে যে!

হঠাৎ অল্প একটু মাথা তুলল আরতি, হলদে ছোপ লাগা চোখ মেলে ড্যাবড্যাব করে তাকাল. দেখুক, দেখুক—তারপর ঝরঝর করে উথলে কেঁদে আবার বালিশে মুখ গুঁজল আরতি।

॥ তিন ॥

কলোনিতে ঢুকবার মুখে সদর রাস্তা অবধি ইলেকট্রিক এসেছে। কলোনির মধ্যেও হয়তো একদিন আসবে, কিন্তু কবে আসবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ইলেকট্রিক না থাকার জন্য তুলালরা যে খুব একটা অসুবিধা ভোগ করে এমন নয়, কিন্তু বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো ফ্যান ইত্যাদি থাকার সঙ্গে কৌলিন্য বাড়ার একটা সম্পর্ক আছে। এ এক ধরনের কমপ্লেক্স। আর এই কমপ্লেক্স কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনিতে যারা বাস করে তাদের সকলেরই।

তুলাল বোঝে, ইলেকট্রিক না থাকার জন্য কলোনির লোকগুলিই দায়ী। অনেক কলোনিতে এ সব আদায় করার জন্য একটা করে কমিটি থাকে, এখানে সে সবের বালাই নেই। কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনি রক্ষা ভাণ্ডার নামে প্রথম দিকে একটা সংস্থা নাকি চালু ছিল। সেই রক্ষা ভাণ্ডারের টাকায় কেউ কেউ নাকি নিজেদের বাড়িঘর বানিয়ে নিয়েছে। তারপর তাই নিয়ে কলোনি পলিটিক্স, তাই নিয়ে দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি।

আর এরই ফলে আগে গোটা কলোনিতে তুর্গোপুজো হত একটা। এখন জোর কদমে কমপিটিশন চালিয়ে হয় তিনটে। ফলে, আগে যেমন একটা পুজোতে চাঁদা ছোঁয়ালেই বাঁচা যেত, এখন তিন জায়গাতেই না দিয়ে উপায় নেই। রক্ষা ভাণ্ডারে অবশ্য মাসিক চাঁদা দেওয়ার পাটটা বন্ধ করে দিয়েছে তুলালরা। রক্ষা ভাণ্ডারের জন্য আর কারো আগ্রহও নেই। এখন সংঘবদ্ধভাবে কালোনিতে বাস করেও সবাই একা একা! অথচ সংঘবদ্ধভাবে তদ্বির তদারক না করলে যে এ কলোনিতে ইলেকট্রিক আসার কোন ভরসা নেই তা সবাই জানে। জানে অথচ চুপ করেই থাকে।

এখন কলোনিতে দশ দশটা পার্টির প্রভাবও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

পার্টিতে পার্টিতে মারদাঙ্গা তেমন কিছু না হলেও এখন কথায় কথায় রুশ, চীন, সি আই এ, কে জি বি। এখন এ কলোনির লোকদের কাছে কলোনির চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হচ্ছে গোটা পশ্চিমবঙ্গ কি ইণ্ডিয়া। দিল্লির রাজনীতির খবর এখন এ কলোনিকে অনেক বেশি বিচলিত করে, অনেক বেশি ভাবায়। কলোনির ডেভলপমেণ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না কি আসে যায় তাতে!

দুলালের অবশ্য এ সব ভাল লাগে না। কলোনিতে কে কোন পার্টি করছে, দুলাল তা নিয়ে তেমন মাথাও ঘামায় না। জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই দুলাল এসব দেখে আসছে। এখন ওর বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ হতে চলল। এ বয়সে ওর যা হওয়া উচিত ছিল তা ওর হয় নি। এখন পর্যন্ত দুলাল কোন একটা ভাল কারখানায় বা অন্য কিছুতে ভাল মাইনের চাকরিও যোগাড় করে নিতে পারল না। জীবনে যে কোথাও পাকাপোক্তভাবে ও বসতে পারবে সে আশা ওর হারিয়েই যাচ্ছে। কতবার চাকরি হতে হতে নাকের ডগা অবধি এগিয়ে এসেও আবার তা কেটে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আর একটু যদি পড়াশুনা করতে পারত দুলাল তাহলে হয়তো সত্যিকার একটা হিল্লে হত। কোন রকমে স্কুল ফাইন্যালের গণ্ডীটা গড়িয়ে গড়িয়ে পার হয়ে এসেছে দুলাল। তারপরই রোজগারের ঘানি চক্করে ওর ঘোরা শুরু হয়েছে। তাছাড়া ওর উপায়ও ছিল না। ওর বাবা ওকে পুরোপুরি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার আগেই চোখ বুজলেন। সংসারে তখন ওরা অসহায় দুটি প্রাণী, মা আর ছেলে। ওর মা-ই ওকে মুকুন্দবাবুর কারখানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে ওর বাবার পরিচয় ছিল মাছ ধরার মাধ্যমে। অত সামান্য পরিচয়ে কারো কাছে চাকরির প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু মুকুন্দবাবু বিমুখ করেন নি। ওর কারখানায় সামান্য খাতা লেখার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন ওকে। দুলালের সেই হাতে-খড়ি।

তখন ওর মাইনে ছিল সাকুল্যে মাত্র একশ' পঁচিশ টাকা। কিন্তু ঐ সামান্য টাকা ওর হাত-খরচের যোগান দিতেই প্রায় ফুরিয়ে যেত।

দুলাল মুকুন্দ এন্টারপ্রাইজের চাকরিটা না ছেড়েই আরো টোপ ফেলতে লাগল সাত জায়গায়। শেষটায় নিজেরই ব্যবসা করার নেশা মাথায় চাপল। কিন্তু ব্যবসা কখনো করব বললেই করা যায় না। প্রথমেই চাই ক্যাপিটাল। দুলাল ভাবল, মায়ের কাছ থেকে পাঁচ-সাত শ' টাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে ও শুরু করে দিতে পারে।

কথাটা মা'র কাছে বলতেই প্রীতিলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, টাকা, আমি কোথায় টাকা পাব? আমার কি টাকার গাছ আছে নাকি?

দুলাল বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, দাও না মা, এমন একটা ব্যবসার কথা ভেবেছি যাতে সেন্ট পারসেন্ট প্রফিট। একবার একটু কেনা-বেচা শুরু করে দিতে পারলে সুদ সুদ্দু তোমার টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দেব। দাও না।

—মর জ্বালা, কোথায়.পাব টাকা! তোর বাবা লোহার সিন্দুকে টাকা ভরে রেখে গেছে কি না!

—বাবা কি করে গেছে, না গেছে তা আমার জানার দরকার নেই। তবে তুমি চেষ্টা করলে ঠিক পার। দাও না মা।

—দু' এক টাকা হলে কথা ছিল। কিন্তু পাঁচ সাতশ' টাকা আমি কোথায় পাব?

দুলাল একটু থমকে থেকেছিল, বলল, কেউ যদি এ সময় একটা কানের দুল বা বালা নিয়ে আসে এখনি তো সুড়সুড় করে টাকা বেরিয়ে আসবে। তোমরা ও ভাবে কম টাকা রোজগার করেছ?

—তা তো বলবিই। তোর বাবা ও সব করত বলেই এখনো হেঁটে চলে বেড়াতে পারছিস। তোর বাবা রোজগারও করেছে, খরচও করেছে।

দুলাল বিরক্তি মিশিয়ে বলেছিল, কাজটা কিন্তু বাবা একদম ভাল করত না। সারাদিন ঐ পুকুর পাড়ে বসে মাছ ধরত, আর রাতে অন্ধকার ঘরে বসে বন্ধকী সোনাদানা নিয়ে হিসেব কষত।

—যার জিনিস তাকে আবার সময়মতো ফেরতও দিয়েছে। লোকের কোন দিন উপকার ছাড়া অপকার করে নি।

—তা যা বলেছ। দুলাল ঠোঁট বাঁকা করে বলল, অনেকে আবার সুদের ভারে এখানে এসে মাথাও ঠুকেছে। তারপর হঠাৎই থেমে গেল দুলাল। আরো অনেক কথাই হয়তো বলতে পারত, কিন্তু নিজের বাপ মায়ের কথা ভেবেই চুপ করে গেল। তাছাড়া এসব বলে জল ঘোলা করলে তো টাকা বেরুবে না, দুলাল মায়ের মন গলাবার চেষ্টা করল, দাও না মা; তুমি বরং আমাকেই বন্ধক রেখে কিছু টাকা দাও।

প্রীতিলতা ছেলের ব্যবসা করার আগ্রহ দেখে কিছুটা যে উৎসাহ বোধ না করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু ঘরের টাকায় কেন! ঘরে দু'চার পয়সা যা পুঁজি আছে তা ফুরিয়ে ফেলতে ক'দিন।

—কি ব্যবসা করবে শুনি ?

দুলাল সাগ্রহে বলেছিল, আলতা সেন্ট কুমকুম বানাব, বিক্রি করব। ও-গুলোর এখন দারুণ বাজার।

—ও-সব কি করে বানায় জানিস ?

—যারা জানে, এমন লোক আমার সঙ্গে থাকবে। আমাদের অফিসে অনেক নাম করা কেমিস্ট আছে।

প্রীতিলতা কেমিস্ট বোঝেন নি। কিন্তু তীক্ষ্ণ বৈষয়িক মন, প্রশ্ন করেছিলেন, তাহলে ওরা করে না কেন ? এত লাভ যে ব্যবসায়, সে ব্যবসা না করে ওরা মরতে ঐ চাকরি করে কেন ?

—টাকা থাকলে ঠিক করত। একসঙ্গে ঐ টাকাটা যোগাড় করাই মুশকিল।

—তাহলে জেনে রাখ, ঐ টাকা তোর পক্ষেও যোগাড় করা মুশকিল। নিজে চাকরি থেকে জমিয়ে জমিয়ে যদি করতে পারিস তা হলে কর, আমি আপত্তি করব না।

মাসখানেক মায়ের পেছনে লেগে থেকে দুলাল অবশ্য পাঁচ শ' টাকা ঠিকই আদায় করে নিয়েছিল। নিয়েই মুকুন্দ এণ্টারপ্রাইজের খাতা লেখার চাকরিটা ছেড়ে দিল। তারপর বাড়িতেই বসে পড়ল

যন্ত্রপাতি নিয়ে। সে সময় বড় দুটো কড়াই কিনেছিল, কিনেছিল কাচের কিছু শিশি বোতল। আরো কত কি, ছাঁকনি, পাখা, ফিল্টার···

কিন্তু ব্যবসা যে পুরোপুরি চারশ বিশ ব্যাপার, এ ধারণা ব্যবসায় না নামলে ওর কোন দিনই হত না। এক মাসের মধ্যেই প্রচুর মাল তৈরি করে ফেলেছিল ও। পয়সা খরচ করে কত সুন্দর সুন্দর লেবেল ছেপেছিল, এখনো এদিক ওদিক খুঁজলে হয়তো লেবেলের বাণ্ডিলগুলো চোখে পড়তে পারে।

গ্রোসকে গ্রোস আলতার শিশি দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিয়ে এসে এক চতুর্থাংশ পয়সাও যদি ও আদায় করে উঠতে পারে। বাজারে অত বাকি পড়ে গেলে ব্যবসা সামাল দিতে চাই আরো টাকা। কিন্তু আর টাকা কোথায়! আর এক কানা কড়িও ছাড়েন নি ওর মা। পাঁচশ' টাকা ক্যাপিটাল মাস দুয়েকেই খতম করে পুরোপুরি বেকার হয়ে গেল দুলাল।

টানা পাঁচটি বছর কেটেছে ওর ছন্নছাড়া অবস্থায়। শেষটায় আবার মাথায় চাপল ব্যবসা। তবে, এবার আর মাল তৈরি করার ঝুঁকিতে নেই ও, এবার সামান্য পুঁজি সামান্য ব্যবসা। কলোনির মুখে সদর রাস্তার ধারেই তিন চারটে বাঁশের খুঁটি পুঁতে উপরে চাটাইয়ের ছাউনি দিয়ে একটা চায়ের দোকান বানিয়ে ফেলল দুলাল। সামান্য দুধ চিনি চা আর একটা কয়লার উনোন, কিছু কয়লা, আর লেড়ে বিস্কুট। গোটা ত্রিশেক টাকা এপাশ ওপাশ থেকে চেয়েচিন্তে ধার করে জয়দুর্গা বলে নেমে পড়েছিল দুলাল। মাস তিনেকের মধ্যেই ও জমিয়ে ফেলল। দু তিনটে কাঠের বেঞ্চ যোগাড় করে ফেলল! চায়ের সঙ্গে আইটেমও বাড়িয়ে ফেলল, কেক আর আলুর দম। আলুর দম রান্না হত বাড়িতে। ডেকচি ভরা আলুর দম রান্না করে ওর মা-ই দোকানে পাঠিয়ে দিতেন, টালি বেকারীর হরিদা বাকিতে রুটি সাপ্লাই দিতে শুরু করল। দিন গেলে তখন আট টাকা দশ টাকা ওর কে খায়।

উৎসাহে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল দুলাল। দোকানের ছিরি-ছাঁদও বেশ কিছু পালটে ফেলল ও। রাজমিস্ত্রী লাগিয়ে দোকানের

চালে টালি বসিয়ে দিল। তিনপাশে দাপনার বেড়া পড়ল। সামনে লাগাল ঝাঁপ। দরকার হলে ওখানে রাতেও থেকে যাওয়া যাবে। আর মাস ছয়েক দোকানটাকে চালাতে পারলে একটা ছোকরা রাখার কথা চিন্তা করবে দুলাল। ছোকরা রাখতেই হবে, নইলে সেই কোন ভোরে এসে দোকান খোলা, বাড়ি ফিরতে ফিরতে গভীর রাত। শরীর যেন দুরমুশ হয়ে যাচ্ছিল ওর।

যতদূর মনে পড়ছে, তখন বাংলা দেশে নতুন সরকার গদীতে এসেছে। সে কি উত্তেজনা, সে কি উচ্ছ্বাস। সেই উচ্ছ্বাসের জের দুলালের চায়ের দোকানেও এসে ঢেউ তুলতে শুরু করল।

দেখতে দেখতে চায়ের দোকানটা হয়ে উঠল উঠতি মস্তানদের সরাইখানা। কখনো কখনো মনে হত, এটাই যেন একটা পার্টি অফিস। মিনিস্ট্রি কিভাবে চলবে না চলবে তা ঠিক করার দায়িত্ব যেন চায়ের দোকানের খদ্দেরদের ঘাড়েই চেপে বসেছে। দুলাল কিন্তু কাউকে কখনো কথা বলায় বাধা দিত না। শত হোক ওরাই দোকানের খদ্দের, ওরাই দোকানের লক্ষ্মী। ধারে খাক আর নগদেই খাক ওদের দৌলতেই ওর দোকান চলবে।

দোকানে যারা আসত তাদের সবাইকে যে দুলাল চিনত এমন কথা নয়। অনেককেই চিনত না। মনে হত বেপাড়ার ছেলে। বন্ধু বান্ধবের সুবাদেই এ পাড়ায় আড্ডা। আবার অনেককেই চিনত, যারা কলোনিতে এতকাল ভিজে বেড়াল বলে পরিচিত ছিল এখন ওদের পড়াশুনা আর জ্ঞানগম্যি দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ওর ধারণাই ছিল না, ল্যালাক্যাবলা জংলাও রাজনীতি নিয়ে আর দশজনের সঙ্গে তর্কে মাততে পারে। বিন্দুর মা বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করে বেঁচে আছে, সেই ঝিয়ের ছেলে বিন্দুও এখন কলোনির একজন নেতা। ও নাকি এস. ইউ. সি. করে। দেশ যে বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছে সন্দেহ কি!

দুলালের অবশ্য উদ্দেশ্য একটাই, যে যা পার্টি কর বয়ে গেছে, চা কেক আর আলুর দম বিক্রি হলেই হল। দুলালের টারগেট দিনে

নগদানগদ, কুড়ি টাকা করে আয়। তারপর শালা দেখে নেওয়া যাবে, সেলামী দিয়ে বড় রাস্তার ওপর দোকান ভাড়া নিয়ে 'দুলাল কাফে' করা যায় কিনা।

রাজনৈতিক ঘটনায় তখন ভরপুর পশ্চিম বাংলা। দিন বদলাচ্ছে। হাওয়া বদলাচ্ছে। পৃথিবী বদলাচ্ছে। একদিন একটা ঝামেলা বাধিয়ে বসল জংলা। হঠাৎ কথায় কথায় হাতের চা সুদ্ধ গ্লাসটা দুম করে ছুঁড়ে মারল বিধানের দিকে। বিধানের কপাল ফেটে চৌচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে শুরু করল সেখান থেকে। রক্ত দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা আধলা ইঁট জংলাকে তাক করে ছুঁড়ে মারল পানু। পানু বিধানের চামচা। ইঁটটা মিস হল। জংলা একলাফে হাওয়া। কিন্তু ততক্ষণে চারপাশে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। দোকান লুট হয় আর কি! শয়ে শয়ে লোক জমে গেল। কে কার কথা শোনে, কে কাকে সামলায়। সেই হুজ্জুতের মধ্যে দুলালের চারটে গেলাস হাপিস হয়ে গেল। একপাশের বেড়া ভেঙে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে গেল। বিধানকে রিকশায় চাপিয়ে হাসপাতালে পাঠান হল। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সব পরিষ্কার। সেদিনকার মতো দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিল দুলাল। গুজব রটে গেল, পুলিস, পুলিস আসছে।

একটা পুলিসভ্যান সেদিন এসেছিল ঠিকই। কিন্তু সামান্য দু চার কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে গেল।

পরের দিন আবার যথাবিহিত দোকান খুলল দুলাল। আর সে দিন ওর জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। স্মরণীয় এই জন্য যে সে দিন থেকেই থানার লোকজনের সঙ্গে ভাবসাব হওয়ার একটা দরজা খুলে গেল ওর।

সে দিন ওর দোকানে চা খেতে এলেন এক ভদ্রলোক, মাঝারি বয়স, একটু লম্বা, কাঁধদুটো একটু ঠেলে ওপর দিকে উঠে থাকা। চোখে চশমা, পরনে জল-কাদা মাখা একটা পাজামা, একটা শার্ট। ভদ্রলোকের হাতে একটা মোটা মতো বই।

—চা হবে ?

দুলাল সবে দোকান খুলে উনুনে হাওয়া দিতে বসেছে। উনুনে জলের ডেচকি বসানো আছে। লোকটার দিকে তাকাল, চেনা মনে হল না। বলল, বসুন, জলটা গরম করে নি।

দুলাল জানে, ওর দোকানে যারা আড্ডা মারতে আসে, তাদের এত সকালে ঘুম ভাঙার কথা নয়। দুলাল যদি দোকান না চালাত, ও নিজেও এসময়টা বালিশ আঁকড়েই পড়ে থাকত।

ভদ্রলোক বেঞ্চের উপর পা তুলে আসন পিঁড়িতে বসার মতো পা তুলে বসলেন। তারপর উনুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি বুঝি এই কলোনিতেই থাকেন ?

—কেন বলুন তো ? কৌতূহলে তাকিয়ে ছিল দুলাল।

—না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। কলোনির লোক বলেই এখানে এভাবে দোকানঘর বানাতে পেরেছেন। অন্য কেউ কি পারত।

প্রসঙ্গটা ভাল লাগল না দুলালের। তবু নিজের সমর্থনে যুক্তি দাঁড় করাবার জন্য বলল, জায়গাটা খালি পড়ে আছে বলেই করেছি। কর্পোরেশন বা পুলিস যদি উঠিয়ে দেয়, উঠে যাব।

—উঠে যাবেন! ব্যবসা ডকে তুলে দিয়ে উঠে যাবেন, বলেন কী মশাই! কোথায় যাবেন ?

দুলাল একটু যেন ভালমানুষী দেখাতে গিয়েই বলেছিল, উঠে যাবে। কিন্তু একবার যা বলে ফেলেছে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বলল, আমি দোকানঘরের খোঁজ করছি। আমার ইচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট বানাব। চাও রাখব কফিও রাখব।

—সে অবশ্য ভাল। বাঙালীরা তো ব্যবসাই করতে চায় না। কেবল চাকরি চাকরি করে পাগল হয়, আপনাকে দেখে সত্যি ভাল লাগছে।

দুলাল আর একবার লোকটাকে ভাল করে দেখে নিল। হাতের বইটা ওর চেনা চেনা লাগল। এমনিতে বই-ফইয়ের খুব একটা ধারে

থাকে না ও, কিন্তু এই ধরনের একটা বই কবে কোথায় যেন ও দেখেছে।

—কি দেখছেন ? এটা 'মা'। গোর্কির 'মা'।

দুলাল বলল, আর একদিন এরকম একটা বই আর একজনের হাতে দেখেছিলাম। কে যেন এখানেই হাতে করে নিয়ে এসেছিল চা খাওয়ার সময়।

—দেখতেই পারেন। রুশ বিপ্লবে এই একটা বই যে কত সাহায্য করেছে তা বলে বোঝান যায় না। আমি তো মশাই বার তিনেক পড়ে ফেলেছি, আবার শুরু করেছি।

জল টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল ডেকচিতে। দুলাল চা বানাতে বসে পড়ল।

—আপনি পড়বেন ?

দুলাল মৃদু একটু হাসল, না। সময় কোথায় যে পড়ব।

—তা অবশ্য ভাল, রাজনীতি-টাজনীতি থেকে দূরে থাকাই ভাল। যা দিনকাল পড়েছে, দু'বেলা ভাত জোটাতেই প্রাণান্ত হতে হয়, তাই না?

দুলাল মাথা নাড়ল, তাই!

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? কাল বিকেলে আপনার এখানে নাকি খুব একটা ঝামেলা হয়ে গেছে ?

দুলাল লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারছিল না। কি বলতে কি বলে বিপদে পড়ে যাব কে জানে! সংক্ষেপে মাথা নাড়ল, হুঁ।

—যারা ঝামেলা করল তারাও তো কলোনিরই ছেলে। তাদের তো আপনি চেনেনই।

—কেন বলুন তো ? চায়ের গ্লাসে শব্দ করে চামচ নাড়তে নাড়তে আবার লোকটার দিকে তাকাল দুলাল।

—না আমি যা শুনলাম, সে তো মশাই বন্ধু বান্ধবের ব্যাপার। তারই মধ্যে ড্যাগার ছুরি বেরিয়ে পড়ল।

—ড্যাগার! কৈ না তো!

—ঐ হল, ড্যাগার না হোক আর কিছু হবে।

তুলাল চায়ের গ্লাসটা এগিয়ে দিল, বিস্কুট দেব ?

লোকটা বোয়মের দিকে তাকাল, না থাক! আপনি ডিমটিম রাখেন না ? এই সকালে একটা হাফ-বয়েল খেতে পারলে ভাল হত।

তুলাল বলল, দেখছেন এই তো দোকান। হাফ-বয়েলের খদ্দের কোথায় পাব বলুন। তাছাড়া আর বেশি জিনিসপত্র রাখতেও সাহস হয় না। কবে পুলিস এসে ঘাড় ধরে তুলে দেবে তার ঠিক আছে!

লোকটা হাসল, ধুর মশাই, একবার মাটিতে শেকড় বসে গেলে ওঠানো সোজা কথা! তা পুলিসের কথা যদি বলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। পুলিস কোন দিন আপনাকে তুলবে না।

—কি রকম ?

লোকটা চারপাশে তাকাল। পুলিস মশাই রাতকে দিন করতে পারে। আসুন না একদিন, থানার বড়বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব। খুব ভাল লোক।

লোকটাকে কেমন রহস্যময় মনে হল তুলালের। কি জানি বাবা, শেষ পর্যন্ত আবার কোন ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে না তো! এমনিতেই পুলিস থেকে দশ হাত দূরে থাকা উচিত, কিন্তু এ যে ওকে বাঘের ঘরেই টেনে নিয়ে যেতে চায়।

তুলাল বলল, ঠিক আছে, যদি দরকার হয় আপনাকে বলব।

লোকটা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঝন্টিরা তিন চার জন মিলে চা খেতে এল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তুলাল।

—এই যে তুলালদা, চা বানাও তিনটে। তুমি সিগারেট রাখ না কেন তুলালদা ? চা খাব এক জায়গায়, সিগারেট খেতে যাব আর এক জায়গায়। তোমাকে মাইরি বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম।

তুলাল এসব কথা কেবল শুনে যায়, উত্তর দেয় না। আপন মনে চা বানাতে বসে গেল। লোকটা বলল, আমি উঠি তুলালবাবু। পরে আবার আসব, হ্যাঁ! পয়সা মিটিয়ে দিয়ে লোকটা চলে গেল।

ছুলালের বুকের ভেতর খচখচ করতে শুরু করল। লোকটার কি কোন অভিসন্ধি ছিল। নির্ঘাৎ কিছু মতলবে এসেছিল লোকটা। নইলে গায় পড়ে অত কথা বলে। কিন্তু যাই বলুক, এ সব কথা ভাঙল না ছুলাল।

শেষ পর্যন্ত ঐ লোকটাই ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। ছুলালের চোখের সামনে আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে একদিন স্পষ্ট হয়ে খুলে গেল। থানার বড়বাবু লোকটা সত্যি সত্যি ভাল। বাইরে থেকে থানার লোকগুলোকে যেমন মনে হয়, আদপেই তারা তেমন নয়। তাদেরও বাজার থেকে কুমড়ো কিনে বেগুন কিনে খেতে হয়। তাদেরও ঘর-সংসার আছে। ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায় বিচার বোধ আছে। মেজবাবু যে হারমোনিয়াম বাজিয়ে অত ভাল রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন তা ওর ধারণাই ছিল না। পুলিসের গলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলে কে না চমকায়।

মাস তিন চারেকের মধ্যেই থানার লোকগুলোর সঙ্গে ছুলালের দহরম মহরম হয়ে গেল। কি করে বাড়তি ছুচার পয়সা কখনো সখনো আয় করা যায়, তা ছুলালের আয়ত্তে চলে এল।

আর সেই লোকটাই ওকে চলন-বলন সব কিছু শিখিয়ে দিল। থানায় ওর একটা আলাদা নামও যে আছে সেটা জানত না ছুলাল! লোকটার বাপের দেওয়া নাম হরিপদ পাল। সংক্ষেপে এইচ. পি. পি.। থানায় ওকে হর্স পাওয়ার না বললে এখন আর কেউ বোধহয় চেনেই না।

হর্স পাওয়ারই একদিন বলল, আপনার দিকে আমাদের নজর ছিল অনেক দিনের। এসব ছোটখাট চায়ের দোকানগুলোর দিকে সব সময় আমাদের নজর রাখতে হয়।

—কেন বলুন তো?

—কেন তা বলতে হবে! বোঝেন না। এগুলি থেকে যত খবর হাতে আসে তা আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন। এ সব চায়ের

দোকান আসলে সব খবরের ডিপো। আপনি শুধু চোখ কান খোলা রেখে চা বিক্রি করে যান, তা হলেই হবে। আর বুঝলেন তো, দু'চার পয়সা যদি ফালতু রোজগার চান।

নতুন আর এক জীবনের আস্বাদ পেয়ে গিয়েছিল দুলাল। চারদিকে কেবল রহস্য, চারদিকে কেবল সন্দেহ! কেউ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে হেসে উঠলেও সন্দেহ জাগে দুলালের : কেউ গুম হয়ে বসে থাকলেও সন্দেহ। কি কুক্ষণেই যে হর্স পাওয়ারের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল।

॥ চার ॥

রাজনৈতিক আগুন একবার জ্বলতে শুরু করলে তাকে নেভান বড় কঠিন। মিনিস্ট্রিকে নিয়ে সেই আগুন জ্বলে উঠেছিল কলকাতায়। কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনি কলকাতারই অঙ্গ। ফলে সেই আগুনের হল্কা থেকে কলোনির ছেলেরাও বাদ গেল না। এর আগেও বেশ কয়েকবার বাংলা বন্‌ধের চিত্র দেখেছে দুলাল। সেবার বড় ভয়াবহ আকার ধারণ করল। সকাল থেকেই খবর আসতে শুরু করল গুলি চলেছে, টিয়ার গ্যাস চলেছে। মেহনতী মানুষের আন্দোলনকে লাঠি গুলি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।

বন্ধের কয়েকদিন আগে থেকেই হর্স পাওয়ার ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করে দিল দুলালের দোকানে। কি দুলালবাবু কি রকম হচ্ছে?

দুলাল বড় সমস্যায় পড়ে। অথচ পুলিসে যখন একবার ওকে ছুঁয়েছে, অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বাঘে ছুঁলে যেমন আঠারো ঘা, এও তেমনি।

দুলাল ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেটুকু জানে, পাচার করে দিতে বাধ্য হয়।

হর্স পাওয়ার ভরসা দেয়, আরে মশাই এ সময় একটু বেশি করে সতর্ক থাকতে হয়। একটা মোক্ষম খবর বার করুন, আপনার কপাল

ফিরে যাবে। বাড়িগাড়ি যদি করতে চান, তাহলে অত দোনামনা-করলে কোনদিন পারবেন না।

দুলাল ঢোক গেলে, না মানে ইয়ে! আমার ঠিক ভাল লাগছে না এসব।

—কেন?

—না মানে, কবে জানাজানি হয়ে যাবে। মুণ্ডু কেটে নিয়ে ওরা ওই লাইট পোস্টে ঝুলিয়ে রাখবে।

—রাখলেই হল। আপনার পেছনে কারা কারা আছে জানেন? আপনার গায়ে হাত দেওয়া মানে সরকারের গায়ে হাত দেওয়া। আর তার ফলে পুরো কলোনিটাই জ্বালিয়ে দেওয়া হতে পারে জানেন? সব বেটার বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দেওয়া হবে।

—কার কি হবে না হবে, সে তো পরের কথা। কিন্তু তার আগে আমারই টেকা দায় হয়ে উঠবে।

—কেন যে মিছিমিছি অত ভাবছেন, বুঝি না। আপনি যে আমাদের হেল্‌প করছেন কেউ জানলেতো! কেউ জানবে না। আপনি কি নিজে বোঝেন না, বড়বাবুর সঙ্গে কতদিন তো দেখা করে এলেন কেউ টের পেয়েছে? শুনেছেন কোনদিন?

—না মানে, একদিন ফাঁস হয়ে গেলেই দফারফা। দোকান-ফোকান সব ডকে উঠবে।

—এই হল আপনাদের নিয়ে ঝামেলা। আরে মশাই, দোকান যদি আপনার উঠেই যায়, আপনি যদি চাকরি করতে রাজী থাকেন, আমরাই আপনাকে চাকরি পাইয়ে দেব।

—বেশ, তাহলে চাকরি দিন।

—আপনি একটা মোক্ষম কিছু ছাড়ুন। কিছু দেবেন, তবে তো কিছু পাবেন!

—ঠিক আছে, খবর যদি কিছু থাকে ঠিক দেব।

কিছু কিছু সময় এমন সব যোগাযোগ ঘটে যায়, যার কার্যকারণ ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। কলোনিরই একটা বাড়িতে যে ছোটখাট একটা বোমার কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তা কাকপক্ষীরও জানার কথা নয়। কিন্তু দুলাল জেনে গেল। বাংলা-বন্‌ধের দিনে এমন একটা খবর হাতের মুঠোয় চলে আসা কম কথা নয়। দুলাল টুক করে এক ফাঁকে বড়বাবুর কানে তা পৌঁছেও দিয়ে এল। নগদ কিছু টাকাও ও পকেটে পুরে নিয়ে এল।

কাজটা যে ও আদৌ ভাল করে নি টের পেল দিন সাতেক পরে। পুলিস এসে রুল দিয়ে পেটাতে পেটাতে জংলা আর মাধবকে ধরে নিয়ে গেল। বোমার মসলাপাতিসহ ওরা হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। না জানি শেষপর্যন্ত কি হয়!

কিন্তু খবরটা যে দুলালই জায়গা মতো জানিয়ে এসেছে, ওদের দলের লোকেরা তা জানল কি করে! তবে কি ওদেরও ইনফরমার আছে! দুলালের হাত-পা কেমন অবশ হয়ে এল। দুলাল বুঝতে পারল, কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে। সেই গণ্ডগোলের ভেতর থেকে বেরুতে না পারলে রক্ষে নেই।

হর্স পাওয়ারকে চেপে ধরল দুলাল, এটা কি রকম হল, আমি যে খবর দিয়েছি ওরা জানল কি করে?

হর্স পাওয়ার বিস্মিতচোখে তাকাল, তার মানে?

—মানে, মানে জানতে চান? গতকাল রাতের দিকে আমার দোকানে দুটি ছোকরা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে। বলে গেছে, জংলাদের যদি কিছু হয়, তাহলে আমাকেও ওরা ছাড়বে না।

—কেন, জংলাদের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক?

—ন্যাকা সাজছেন?

—না, মানে ওরা কারা? আপনি চেনেন ওদের? কোথাকার ছেলে?

দুলাল বলল, চিনলে তো ব্যাপারটা বুঝতেই পারতাম। মনে হল বেপাড়ার ছেলে। আমাকেই ওরা জংলাদের ব্যাপারে সন্দেহ করছে।

—অসম্ভব, হতেই পারে না। কি বলল ওরা ?

দুলাল বলল, একেবারে সরাসরি আমার দোকানে এসে চার্জ করল। ওদের ধারণা আমিই নাকি পুলিসের কানে খবর তুলে দিয়েছি।

হর্স পাওয়ার চারপাশে একবার তাকাল, তা আপনি কি বললেন ?

দুলাল বলল, আমি আর কি বলব! আমি অস্বীকার করলাম, আমি কিছুই জানি না বোঝাতে চেষ্টা করলাম। শেষপর্যন্ত ওরা কি ভাবল কে জানে, চলে গেল। যাবার সময় আবার বলে গেল, জংলাদের কিছু যদি হয় তাহলে আমাকেও ওরা ছাড়বে না।

—ছোকরা দুটির চেহারা কেমন ?

দুলাল স্মৃতি ঘেঁটে ওদের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

হর্স পাওয়ার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ওরা ফল্‌স দিয়ে গেছে।

—কি রকম ?

—ওরা জানত, জংলারা এই চায়ের দোকানে আসে, চা খায়। কখনো হয়তো বেফাঁস কিছু বলেও ফেলেছে। আর তাই থেকে ধরে নিয়েছে আপনিই খবর পাচার করেছেন।

দুলাল বলল, আমি আর দোকান করব না। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে, এবার এটা গুটিয়ে ফেলব।

—সে কি! পাগল না মাথা খারাপ। ধুত মশাই, বড় অল্পেতেই আপনি ভেঙে পড়েন।

দুলাল আর কথা বাড়ায় নি। যা হয়েছে, হয়েছে। আর নয়। এবার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য দিকে ঝুঁকতে হবে। এবং বাঁচতে হলে ও ছাড়া আর পথ নেই। চায়ের দোকানের দিকে মনোযোগ কমে গেল দুলালের। কখনো খোলে, কখনো খোলে না। কিন্তু কলোনির খবর কিছু-না কিছু কানে আসেই। তখন আর লোভ সামলাতে পারে না। দু'চার পয়সা যা আসে।

একদিন প্রীতিলতা চেপে ধরলেন, হ্যাঁরে কি হয়েছে তোর বল তো ?

দোকানটা তো বেশ চলছিল. কিন্তু এখন প্রায়ই বাড়ি বসে থাকিস, দোকান খুলিস না, কি হয়েছে তোর ?

দুলাল বলল, ভাল্লাগে না।

—ওমা, ও আবার কি কথা। দু'চার পয়সা যা থেকে আয় হবে, তা ভাল্লাগে না। চাকরি করলেও তো রোজ রোজ যেতে হত।

দুলাল বলল, চাকরিরই চেষ্টা করছি। ওসব দোকান-টোকান আমার ধাতে সইবে না। ও হচ্ছে ছোটলোকদের কাজ।

প্রীতিলতা কেমন ঘোর দেখেন। ছেলেটার মাথায় কি যে হয় মাঝে মাঝে, বুঝে উঠতে পারেন না। বললেন, ভদ্রলোকদের বুঝি ব্যবসা করতে বারণ আছে। ভদ্রলোকেরা বুঝি ব্যবসা করে না ?

—কে কি করে, না করে আমার জানার দরকার নেই, আমি চাকরির চেষ্টা করছি।

প্রীতিলতা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, কি চাকরি ? কোথায় ?

দুলালও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সে হলেই জানতে পারবে। তাছাড়া দোকান তো এখনই তুলছি না, চাকরি খোঁজাখুঁজি করছি, পেলে দোকান তুলে দেব।

অবশেষে সত্যি সত্যি একটা চাকরি কপালে জুটে গেল দুলালের। বিজয়লক্ষ্মী ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানিতে খাতা লেখার কাজ। আপাতত ছ'মাসের জন্য ট্রায়ালে থাকতে হবে। মাসে মাসে থোক তিনশ টাকা মাইনে। ছ'মাসের পর বাবুদের যদি পছন্দ হয়, সব মিলিয়ে তখন মাইনে হবে পাঁচ শ'।

দুলাল একদিন মাত্র ভাববার সময় পেল। একদিনের মধ্যেই ওকে জানাতে হবে ও চাকরিটা করতে রাজী কিনা। দোকানেও এখন মাসে তিনশ'র কম আয় হয় না। 'দুলাল কাফে' তৈরি করতে পারলে মাসে পাঁচ শ' টাকা ওর কে মারে। আর সেসব দিক বিচার করলে বিজয়-লক্ষ্মীতে একটা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। ছ'মাসের পর বাবুরা যদি বলেন, না হে পছন্দ হল না তোমাকে, তখন তো যেই তিমিরে সেই তিমিরে।

তবু সাত-পাঁচ ভেবে চাকরিটাই নিয়ে নিল দুলাল। আর চাকরি নিয়ে বুঝতে পারল, ও ভালই করেছে। কেননা, চারপাশে মিছিল, মিটিং, আর দেয়ালে দেয়ালে যেভাবে পোস্টার লাগাবার ধুম লেগে গেছে, তাতে দোকানে এখন আর টেকা যেত না। ওদিকে মিনিস্ট্রিরও পতন হয়ে গেছে। সারা পশ্চিম বাংলায় এখন রাজ্যপালের শাসন। আবার নতুন করে ইলেকশন হল বলে।

কিন্তু দোকান তুলে দিয়েও থানার বড়বাবুদের হাত থেকে রেহাই পেল না দুলাল। পেছনে যেন ফেউয়ের মতো লেগে রইল হর্স পাওয়ার। মাসে একটা দুটো খবর না জোগাতে পারলে ওর ঘাড়েই না জানি কোপ পড়ে!

দুলাল চাকরি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু থানার সঙ্গে যোগাযোগটা আগের মতোই থেকে গেল।

দুলাল বলে, কী মুশকিল, কলোনিতে আমি থাকি কতক্ষণ যে খবর জোগাব।

হর্স পাওয়ার হাসে। দাদা এ লাইনের এই মজা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। শুধু কলোনির খবরই যে দিতে হবে এমন কথা আছে নাকি! আপনার বিজয়লক্ষ্মীতেও খবর থাকতে পারে। আপনি যেখানেই যাবেন, সেখানেই খবর।

দুলাল গুটিয়ে যায়।

হর্স পাওয়ার বলে, আচ্ছা ওই যে ওই লোকটা ডাস্টবিনের ধারে কাগজ কুড়োচ্ছে দেখছেন, ঐ লোকটার সঙ্গেও যে থানায় যোগাযোগ রয়েছে তা আপনি বিশ্বাস করেন?

—অসম্ভব, হতেই পারে না।

—আপনি তো রোজ সকালে বাজারে যান। ওখানে যে লোকটা ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা বিক্রি করে সে কি ওর ওটুকু আয়েই সংসার চালাতে পারে?

—তার মানে ও লোকটাও!

—একটা কথার কথাই বলছি আর কি! ওই লোকটাই যে হবে এমন কথা নয়। তবে ওরই মতো কেউ না কেউ ওখানে আমাদের লাইনের লোক আছেই। ধরুন, রাস্তার ধারে একটা মুচি বসে বার মাস জুতোয় তাপ্পি মারে, সে লোকটা যে স্পাই নয় বুঝবেন কি করে! তালা-চাবি সারাই-আলা দেখেছেন কোন দিন?

ত্বলালের যেন বিশ্বজ্ঞান হচ্ছিল। কলকাতাটা সত্যি সত্যি বড় তাজ্জব জায়গা।

হর্স পাওয়ার আরো একগাদা ফিরিস্তি শোনাল। সে সব শুনলে মানুষের ওপর মানুষের আস্থা রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ত্বলাল মন্ত্র-মুগ্ধের মতো কেবল শুনল। সমর্থনও করল না, অসমর্থনও করল না। কেবল বুঝল, এবার থেকে আরো সতর্ক হয়ে চলতে হবে ওকে। জীবন বড় কঠিন ঠাঁই।

মাস তিনেক কাটতে না কাটতেই ওদিকে আর এক কীর্তি করে বসলেন প্রীতিলতা। ত্বলাল এখন চাকুরে ছেলে, ত্বলালকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন উনি।

—বিয়ে! ত্বলাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। আমি বিয়ে করব? এই রোজগারে বিয়ের কথা কেউ ভাবতে পারে!

প্রীতিলতা বললেন, রোজগার তো তোর সব সময় এ' রকম থাকবে না। আর ত্ব'তিন মাস পরেই তোর মাইনে পাঁচশ' টাকা হবে।

—হওয়ার কথা, তবে যতক্ষণ না হচ্ছে, বিশ্বাস করি না। মানুষের ওপর আমার আর আস্থা নেই।

—সে কী রে! তুই তো আগে এরকম ছিলি না?

ত্বলাল বলল, কি ছিলাম কি ছিলাম না, সেটা বড় কথা নয়, কথা হচ্ছে এখনই আমার বিয়ে করাটা ঠিক হবে না।

—ঠিক হবে কি ভুল হবে, সেটা আমি বুঝব। প্রীতিলতা ঘটকের

সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করে দিলেন। নিজে দু-একটি জায়গায় পত্রালাপও শুরু করে দিলেন।

অবশেষে বিজয়লক্ষ্মীর তিনশ' টাকার মাইনেতেই বিয়ের ব্যাপারে মত দিল দুলাল। যা থাকে কপালে। নেমে তো পড়ি, এখন যে অবস্থায় আছি এর চেয়ে আর কতই বা খারাপ হবে। বরং বউ ভাগ্যে ভালও হয়ে যেতে পারে।

বেলেঘাটাতে মায়ের সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল ওরা। মনে পড়ছে সে দিনটা ছিল কোন এক রোববার। বাস থেকে নেমে গলির মুখে পা দিতেই কেমন গা ছমছম করে উঠল ওদের। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। সব দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় কোন লোকজন নেই। তবে কি কোন ঝামেলা হয়েছে! চট করে হর্স পাওয়ারের মুখখানা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সারা গা হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠল।

এ অবস্থায় কি যে করা উচিত প্রথম দিকে বুঝতে পারে নি ওরা। প্রীতিলতা ফিসফিস করে বললেন, কি করবি রে দুলু? চল ফিরে যাই।

দুলাল চারপাশে তাকাল, নির্ঘাৎ বড় রকমের কিছু একটা হয়েছে। নইলে এমন থমথমে হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু এখন ফিরেও যাওয়া যায় না। আবার কখন বাস আসবে, আদৌ আসবে কিনা কে জানে। বলল, এসেই যখন পড়েছি, তখন শেষ দেখে যাব মা। বাড়ির নম্বরটা বলো তো?

—সতেরোর বি।

তেরো অবধি দেখা যাচ্ছে। খানিকদূর এগোতেই, ঐ, ঐ তো। সতেরো এ বাড়িটারই পেছন দিকে হবে। অথচ এমন একজনও নেই. যাকে জিজ্ঞেস করা যায়।

এমন সময় হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে টুক করে একটা দরজা খুলে গেল। প্রবীণ এক ভদ্রলোক মুখ বার করলেন, তারপর সটান এগিয়ে

এলেন ওদের কাছে। এই যে প্রীতিলতা দেবী, আসুন, আসুন। তাড়াতাড়ি আসুন।

—কি ব্যাপার বলুন তো ? কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে পরে শুনবেন, আগে ঘরে আসুন। এখনই পুলিস এসে পড়বে।

ওদের একরকম প্রায় টেনেই ঘরে ঢুকিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও বন্ধ করে দিলেন।

হর্স পাওয়ারের কথা আবার মনে পড়ল দুলালের। খবর খবর করছেন, খবর তো মশাই প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। কেবল তা খুঁজে বার করতে যেটুকু দরকার।

কিন্তু আজ একটা শুভ কাজে এসেছে দুলাল। এখন মন থেকে হর্স পাওয়ারকে সরিয়ে রাখাই উচিত।

—বসুন। বিশ্রাম করুন। কি ঝামেলাতেই পড়েছি দেখছেন। আর ওরা দিনক্ষণ পেল না।

—কি হয়েছে ?

—আপনারা তো বড় রাস্তা দিয়েই এলেন, দেখেন নি একটা লাশ পড়ে আছে। আর বলবেন না, এই বেলেঘাটাটা একটা নচ্ছার জায়গা হয়ে উঠেছে।

—লাশ ! দুলাল কেমন বিস্মিত হয়, কই না তো ! কোথায় লাশ ? আমরা তো বাস থেকে নেমে সটান চলে এলাম।

—বাস স্টপ থেকে একটু সামনের দিকে এগোলেই দেখতে পেতেন। একবারে বড় রাস্তার উপরই গলা ফাঁক করে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

—ওমা কী সর্বনাশ ! কাকে !

—যাকে মারল তারও গুণের শেষ নেই। এখন পাড়ায় পাড়ায় মস্তানরাই তো পার্টির লোক হয়ে উঠেছে, কথায় কথায় বোমা ছুরি পাইপগান, কথায় কথায় খুন জখম লুটতরাজ।

—কোন পার্টি ? কারা মারল ? খবরের গন্ধ পাচ্ছিল দুলাল।

—কে জানে কোন পার্টি! ভদ্রলোক মুখ খুলতে নারাজ। যেন মুখ খুললেই ওর মুণ্ডুটাও উড়ে যেতে পারে।

প্রীতিলতা বললেন, আমাদের তাহলে এ সময়ে আসাটা উচিত হল না। আমরা কি করে বুঝব বলুন। এখন ভালয় ভালয় ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।

আরতির মাও ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেতর দরজায় একটা ধবধবে ফর্সা পর্দা ঝুলছে। ওদিকে একটা খাট। সুন্দর ফুল লতাপাতা আঁকা একটা পরিষ্কার চাদর তার ওপরে বিছিয়ে ঘরের ভোলটাকে পালটে রাখার চেষ্টা হয়েছে। দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ছবিআলা একটা ক্যালেণ্ডার। ওদিকে একটা বইয়ের আলমারি। বইয়ের চেয়ে পুতুল খেলনাই বেশি।

ভদ্রলোক বললেন, পুলিস এসে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া আপনারা এসেছেন মেয়ে দেখতে।

দুলাল শুধাল, যারা খুন করে গেল, তাদের আপনি চেনেন?

ভদ্রলোক ফ্যাকাসে চোখে দুলালের দিকে তাকালেন, আমি! আমি কি করে চিনব। আমার কি এখন সে বয়স আছে, যে পাড়ার ছোকরাদের নাম মুখস্থ রাখব।

দুলাল বুঝল, ভদ্রলোকও এড়িয়ে যেতে চাইছেন। নেহাত আজ শুভ কাজে এসেছে দুলাল, নইলে ভদ্রলোকের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকা যেত। মনে মনে হাসল দুলাল। তারপর চুপ করে গেল।

সেই উত্তেজনার মধ্যেই ওরা বেলেঘাটাতে আরতিকে দেখে পছন্দ করে এসেছিল। পরে বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল। প্রীতিলতা দু' হাজার নগদ টাকা বর পণেই রাজী হয়ে গেলেন। পনেরো ভরি সোনা, আর খাট আলমারি আসবাবপত্র তো আছেই।

বাড়ির উঠোনেই প্যাণ্ডেল বাঁধা হল। মাইক আনান হল। বউভাতে দু'শ আড়াইশ' লোককে নেমন্তন্ন করা হল। এ সংসারের পক্ষে

এ কলোনিতে এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। প্রীতিলতা স্নেহময়ী জননীর মতো বধূবরণ করে নিলেন।

আর কিছু দিনের মধ্যেই দুলালের মনে হল, আরতিই ওর সব। আরতিকে ছাড়া ও কোনদিনই বাঁচবে না।

॥ পাঁচ ॥

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস পার হয়ে গেল। আরতিকে যত দেখে, ততই মুগ্ধ হয় দুলাল। ততই মনে হয়, ওর মানুষ জন্মটা কত সার্থক। আরতিকে নিয়ে কত সুন্দরভাবে ও বেঁচে আছে। দুলাল যদি রবি ঠাকুরের মতো কবি হত, ওর জীবনের সব কবিতাই ও আরতিকে নিয়ে লিখত। কিন্তু দুঃখ, কবিতা-টবিতার কথা ও ভাবতেই পারে না। কবিতা ভাবা তো দূরের কথা, আরতির মতো অত গুছিয়ে কথাও বলতে পারে না দুলাল। যা বলতে চায়, তা কেমন উল্টোপাল্টা বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যায়। তখন নিজেকেই কেমন বোকা বোকা লাগে ওর। দুলাল নিজের বোকামি অবস্থাটা কাটাতে গিয়ে আরো হয়তো বোকামি করে বসে। একদিন কি একটা কথার পর দুম করে ও আরতির পায়ে হাত দিয়ে প্রণামই করে বসল, তুমিই মাইরি আমার আসল গুরু ঠাকুর। তোমাকেই যেন সারা জীবন আমি সেবা করতে পারি।

আরতি হা হা করে ওঠে, ধেৎ, কী যে কর! কোন কিছুর মাত্রা রাখতে চাও না তুমি। কেউ যদি দেখে ফেলত!

—দেখুক গে। দুলাল আরো ছেলেমানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। আরতির সঙ্গে ছেলেমানুষিতে মেতে থাকায় যে কী সুখ, কে বুঝবে!

কিন্তু সুখ কখনো এক নাগাড়ে বেশি দিন থাকে না। ওটাই ধর্ম। দুলাল দেখল, এরই মধ্যে ওর জীবনে কত কিছু ঘটে গেল। যা ঘটল, তার কোন জবাব নেই, সারা জীবন হজম করে চলতে হবে ওকে।

কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না দুলাল, শনিবার রাত থেকে তিন তিনটে দিন আরতি কোথায় ছিল, কেন ছিল! কিভাবে আবার ও ফিরে এল।

না, একথা ও হর্স পাওয়ারকেও বলতে চায় না। বলা যায় না, বলবে না। যা ঘটেছে তার কোন প্রতিকার হয় না। দু-চারটে লোককে হয়তো পুলিস চাংদোলা করে তুলে নিয়ে যেতে পারে, রুল দিয়ে পিটিয়ে সারা জীবনের মত নুলো করে ছেড়ে দিতে পারে, কিংবা হয়তো আরো সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে; কিন্তু তারপর!

ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে দুলালের। তারপর কি! আরতি কি তাইতেই সব কিছু ক্ষমা করে দেবে! আরতি কি সেই আগের মতো হয়ে উঠতে পারবে।

অথচ যা ঘটল তার জন্য দুলালই বা কতটুকু দায়ী। ওর কপালটাই আসলে খারাপ; নইলে বলা নেই কওয়া নেই জগদীশের সঙ্গে ওর অত মাখামাখি হতে যাবে কেন! কলোনিতে তো আরো কত আছে, তাদের সঙ্গে তো অত মাখামাখি হয় নি ওর।

জানা কথাই জগদীশ পার্টি করত। পার্টি কে না করে, কিন্তু জগদীশদের বাড়িটা যেন ছোটখাট একটা পার্টি অফিসের মতোই হয়ে গিয়েছিল। ওর দিদি স্কুল মিস্ট্রেস। তার রোজগারেই সংসার চলত ওদের। বাড়িতে সারাক্ষণ ছেলেরা আসত, জানত না পুলিসের নজর ছিল বাড়িটার ওপর।

জানবার কথাও নয়। কিন্তু দুলাল জেনে গিয়েছিল। হর্স পাওয়ারই একদিন পাকড়াও করল দুলালকে, হ্যাঁ মশাই, আপনাদের কলোনিতে জগদীশ বলে কাউকে চেনেন?

এক ডাকেই চিনতে পারল দুলাল কেন বলুন তো?

-- চেনেন কি না বলুন না?

দুলাল বুঝতে পেরেছিল পুলিসে চোখ রেখেছে জগদীশের ওপর। বলল, সামান্য চিনি। কলোনির কারো সঙ্গেই তো খুব একটা মিশি না। পাড়ার ছেলে বলেই যেটুকু আলাপ।

—আলাপটা বাড়ান না। একটু মেলামেশা শুরু করে দিন না।

—কি হবে ?

—কি হবে বুঝতে পারছেন না। ফাঁদ না পেতে রাখলে কি পাখি ধরা পড়ে।

হেঁয়ালির মতো লেগেছিল ত্বলালের। হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিল।

—আপনাকে কিছু করতে হবে না। শুধু ওদের বাড়িতে যাতায়াতটা বাড়িয়ে দিন।

—তারপর ?

—যা বলছি করুন না, কয়েকদিন একটু চোখ কান খুলে যদি ও বাড়িতে যান, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

—কি বুঝতে পারব ?

—এদিকে আস্থন। ত্বলালের কানে কানে হর্স পাওয়ার যা বলল তাতে চমকে উঠেছিল ত্বলাল। যাহ্, হতেই পারে না।

—পারে, পারে। এ পৃথিবীতে সব হয়, সব হতে পারে। দিন দশেক আগেই ও বাড়িতে বসে একটা থ্রি নট থ্রি বিক্রির লেন-দেন হয়েছে। আমাদের হাতে খবর আছে।

হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিল ত্বলাল।

—আমাদের ধারণা ওখান থেকে আরো কিছু লেন-দেন হবে। আমরা কনফার্ম হতে চাই। হাতে-নাতে ধরতে চাই।

ত্বলালের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে এসেছিল, তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু ওসব ব্যাপার কি আমার সামনে হবে ?

—তা হবে না, তবে কয়েকদিন মেলামেশা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে। যারা এসব করে, তারা এক পা সব সময় ফাঁদের দিকে এগিয়ে রাখে। মৃত্থ হেসেছিল হর্স পাওয়ার।

ত্বলাল চুপ করে থেকেছিল।

হর্স পাওয়ার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, কোন রিস্ক নেই মশাই। বরং মোটা টাকা যদি কামাতে চান। এই মওকা।

দুলাল টোপ খেয়ে বসল হর্স পাওয়ারের কথায়। বলল, ঠিক আছে, দেখব। এরপর দুলাল গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিল জগদীশের সঙ্গে। আলাপ করতে গিয়ে বুঝল, জগদীশের মধ্যে রাখঢাক ব্যাপারটা একটু কমই। বরং জগদীশ প্রমাণ করার চেষ্টা করত, ও কমুনিস্ট। গভীর বিশ্বাস থেকেই ও বলত, জীবন যদি দিতেই হয়, বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েই দেব। কাপুরুষের মতো মরতে চাই না আমি।

কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত দুলাল। ওর জীবন চেতনার সঙ্গে জগদীশের আকাশ-পাতাল তফাত। ও চায় সুন্দর করে বেঁচে থাকতে, আরতির সঙ্গে নিবিড় হয়ে বেঁচে থাকতে। সাধ করে কেউ যে অমন ঝামেলার জীবনে ঢুকতে চায় ভাবতেই পারে না দুলাল। ফলে কখনো সখনো জগদীশের সঙ্গে একটু তর্ক করারও চেষ্টা করত ও। বোঝাত, তোমার কি ভাই, তুমি তো আর বিয়ে থা করনি, মাথার ওপরে দিদি রয়েছে চালিয়ে যাচ্ছ। আমি যদি হুট করে বিয়েটা না করতাম তাহলে আমিও তোমার মতো—

বাধা দিয়েছিল জগদীশ, যে মেয়ে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না। তারপর হেসে বলেছিল, উপমাটা বড় মেয়েলি হয়ে গেল, তাই না! যাক গে, সবাই যে পার্টি করবে এমন কথা নয়, তবে পেছনে সবার যদি সমর্থন থাকে, তাহলে সেটাই আমাদের শক্তি জোগাবে।

দুলাল বলেছিল, বিশ্বাস কর ভাই, আমরা কিন্তু সব সময়ই তোমাদের পেছনে। সব সময়ই আমরা তোমাদের সাপোর্ট করি।

কিন্তু এ সব কথা দিয়ে ঠিক মতো কাজ হাসিল করতে পারছিল না দুলাল। রিভলবার-রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল। সময়ে অসময়ে হুম করে জগদীশের বাড়িতে গিয়ে হাজির হত ও, কিন্তু বিন্দুমাত্র বোঝা যাচ্ছিল না, রিভলবার বিক্রির খবরটায় কতখানি সত্যি।

দুলালদের বাড়িতে জগদীশেরও যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। জগদীশও বোধহয় দুলালের ওপর টোপ ফেলতে শুরু করেছিল। গোছা গোছা বই এনে হাজির করত ও। পড়ে দেখ না। মানুষ আর সমাজ সম্পর্কে যদি

জানতে চাও তাহলে এগুলি তোমাকে পড়তেই হবে। আরতির সঙ্গেও মিশে যাবার চেষ্টা করেছিল জগদীশ, এই যে বৌদি শুধু চা খাইয়েই ছেড়ে দিচ্ছেন!

—ওমা, শুধু চা নাকি! বসুন ডিম ভেজে আনছি।

—না না, হেসে সহজ হবার চেষ্টা করত জগদীশ। চা-ই ভাল। চায়েই তো জীবন। আমি এমনিই বললাম।

জগদীশ এলেই তেলে-ভাজা মুড়ি আসত, চা হত একবার-দুবার, কোন কোন দিন তিন চারবারও।

কিন্তু জগদীশের শত্রুও এ কলোনীতে ততদিনে বেড়ে উঠতে শুরু করেছিল। আগে এখানে নকসালদের টিকি ছিল না, কিন্তু দিনে দিনে বারুদ জমতে শুরু করল কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনিতেও। হাওয়া যে বদলাচ্ছিল বুঝতে পারছিল দুলাল, বুঝতে পারছিল জগদীশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াতে শুরু করেছিল। পাড়ায় কিছু নতুন নতুন মুখও ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছিল। দুটো একটা ছোটখাট ঝামেলা যে না হল এমন নয়। কিন্তু জগদীশের বিশ্বাসটা ছিল ওর রক্তের ভেতরে। দু'বার একবার ঝামেলার মধ্যে পড়তে পড়তে জগদীশ নিজেকে সামলে নিয়ে সরে এসেছে।

দুলাল বলল, পাড়ার যা চেহারা দেখছি, তাতে তোমার কিন্তু ভাই একটু সাবধানে চলাফেরা করা উচিত।

জগদীশ হাসত, আমার গায়ে হাত তোলে এমন সাহস কারোর নেই।

—তা না থাকতে পারে। কিন্তু তোমার উচিত সঙ্গে সঙ্গে রিভলবার-টিভলবার কিছু রাখা। তুমি একটু চেষ্টা করলেই তা সঙ্গে রাখতে পার। বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল দুলাল, এতক্ষণে যেন ও এতদিনকার মেলামেশার পর আসল কথায় আসতে পেরেছে।

জগদীশ হেসে বলেছিল, কিচ্ছু দরকার হবে না। এ পাড়ার সবাইকে আমি চিনি। আমার চোখের সামনে দাঁড়ালেই সব কেঁচো হয়ে যাবে।

দুলাল হতাশ হল। রিভলবারের কথা তুলেও ও বিন্দুমাত্র ধরতে পারল না হর্স পাওয়ারের কথা কতটা সত্যি।

দ্রুত হাওয়া পালটে যাচ্ছিল কলোনির। দ্রুত চাকা ঘুরে যাচ্ছিল কলোনির। বাতাসে চাপা ফিসফিস উত্তেজনা। পুঞ্জীভূত বারুদে কেউ যেন দেশলাই জ্বেলে তাণ্ডব শুরু করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সন্ধের পরই থমথমে হয়ে যায় পৃথিবী। দুলাল বুঝল, জগদীশের সঙ্গে এত মাথামাখি করাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না ওর। কে জানে, কে কি ভাবে এখন দেখতে শুরু করেছে ওকেও। অথচ কাউকে ও মুখ ফুটে বোঝাতে পারবে না জগদীশের সঙ্গে কেন ওর 'এত মেলামেশা। কি জানতে চায় ও জগদীশের কাছ থেকে।

মাঝে মাঝে দুলাল ভাবে, না, আর এগোবে না ও। যে ভাবে হাওয়া পালটে যাচ্ছে কলোনির, তাতে ও নির্ঘাৎ বিপদের মধ্যে জড়িয়ে যাবে। থানার লোকদেরই যে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় তার কি মানে! আজকে হর্স পাওয়ার খুব খাতির দেখাচ্ছে, দু' দিন পরেও যে দেখাবে কি বিশ্বাস আছে! কেমন গুটিয়ে আসছিল দুলাল।

কলোনির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়েই চলেছিল। রা-রা করে পাড়াটা যেন মেতে উঠতে শুরু করেছিল। রাতের অন্ধকারে ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠতে হয়। বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে বোমা ফাটার শব্দ ভেসে ওঠে। গায়ে চাদর জড়িয়ে পাইপ গান নিয়ে কারা যে ছুটোছুটি করে জানতে ইচ্ছে হয় না। এখন যে কোনদিন বিস্ফোরণ ঘটবে। যে কোনদিন দুটো চারটে লাশ পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু অত উত্তেজনার মধ্যেও জগদীশ পাড়া ছাড়ল না। জগদীশের এক কথা, কাটা পুকুরের কোন ছেলের সাহস হবে না ওর বুকের ওপর ড্যাগার তুলে ধরে। জগদীশকে যত দেখে, ততই যেন শ্রদ্ধা বেড়ে যায় দুলালের। কিন্তু আরতি কেমন বিরক্ত হচ্ছিল মনে মনে, তুমি কী বল তো, জগদীশবাবুর সঙ্গে অত না মিশলেই কি নয়! আমার ভাল লাগছে না ওসব।

—কেন কি হয়েছে ? থমকে দাঁড়িয়েছিল ছুলাল।

—আমার ভয় করে।

—ভয়! হা-হা করে হেসে উঠেছিল ছুলাল। কি ভয়, কেন ভয়!

—বারে, ভয় করবে না, চারদিকে অত বোমা ফাটছে। হঠাৎ হঠাৎ পুলিস আসছে। আমার ওসব ভাল লাগে না। সত্যি বলছি, তুমি ও সবে যেও না।

—যাই কোথায়! পাড়ায় বাস করলে সবার সঙ্গেই একটু আধটু যোগাযোগ রাখতে হয়। তাছাড়া লোকে জানে, আমি কোন পার্টিতে নেই।

—তুমি জগদীশের সঙ্গে চলাফেরা কর, লোকের আর জানতে বাকি থাকবে না, তুমি কি!

—একা জগদীশ না, আমি সবার সঙ্গেই মিশি। সবার সঙ্গে ভাবসাব না রাখলে পাড়াতে থাকব কি করে! ও কিছু না, তুমি ভেবো না।

—পার্টি না করলে বুঝি পাড়ায় থাকা যায় না ?

—এই দেখ, পার্টি করি কোথায় ? আমি পার্টি করি, হা হা···বেশ বললে যা হোক।

—তা হলে হঠাৎ জগদীশের সঙ্গে অত মিশিতে শুরু করলে কেন ?

—জগদীশদের সাপোর্ট করি। পার্টি না করলেও কাউকে না কাউকে তো সাপোর্ট করতেই হয়। তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো, তুমি কাউকে সাপোর্ট কর না ?

আরতি বুকে হাত দিয়ে বলল, না, কাউকে না। ও সব আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া আমার সময়ও নেই।

ছুলাল একটু দমে গেল। আরতি কাউকে সাপোর্ট করে কি করে না একথা ওর জিজ্ঞেস করা উচিত হয় নি। ও যেন নিজের ঘরেই, নিজের মধ্যেই পুলিসের কাজে লাগবে এমন কিছু খুঁজে বার করার চেষ্টা

করছিল। নিজেকে গুটিয়ে নিল দুলাল। বলল, ঠিক আছে, আর জগদীশের বাড়ি যাব না।

—না যেয়ো না।

—কিন্তু জগদীশ যদি আসে, যদি বলে বৌদি চা দাও?

—কেউ এলে তো তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। এলে দেখা যাবে।

দুলাল ঠিক করে ফেলল, চুলোয় যাক ওর ফালতু রোজগার, আর যাবে না ও। কপালে যদি থাকে আপসে টাকা আসবে। আমার কপাল না হয় খারাপ, কিন্তু আরতির কপালেও তো থাকতে পারে।

এর আগে অবশ্য পাড়ার কিছু কিছু ছেলের খবর ও থানায় পৌছে দিয়ে এসেছিল, কিন্তু আর না। যে যাই ভাবুক, আর ও সবের মধ্যে থাকবে না দুলাল। দিন কয়েক একেবারেই গা ঢাকা দিয়ে থাকল ও।

কিন্তু হর্স পাওয়ার ছাড়বার পাত্র নয়। দিন কয়েক পরেই আবার ধরে বসল দুলালকে, কি হল মশাই? আমাদের একেবারে ভুলে গেলেন যে?

দুলাল বলল, ভুলে যাবো কেন! তবে ও-সব জগদীশ-টগদীশের মধ্যে আমি আর নেই। আমাকে আপনারা প্রাণে মারবেন।

—প্রাণে মারব কেন? হর্স পাওয়ার তাকিয়ে থাকে।

—পাড়ার হাওয়া যেমন গরম, তাতে সবাই এখন ভাবতে শুরু করেছে আমি ওরই দলের লোক। কবে একা পেয়ে আমাকে ঠেঙিয়ে দেয়, কে জানে।

হর্স পাওয়ার হাসল, আপনার গায়ে হাত দিয়ে কেউ পার পাবে?

—না মশাই, আমাকে রেহাই দিন। জগদীশের সঙ্গে মিশে যা বুঝেছি, তাতে ও-সব রিভলবার-টিভলবারের কথা স্রেফ বানানো। ছেলেটা একটু গোঁয়ার ঠিকই, কিন্তু মনে হয় না ও-সব ও করে।

—মানুষকে কি মশাই এত তাড়াতাড়ি চেনা যায়। ঠিক আছে, আপনি ওর সঙ্গে আর মিশতে চাইছেন না, মিশবেন না। কিন্তু চোখ

কান খুলে রেখে যা পান, তাই কুড়িয়ে আনুন। তাতেই আমাদের হবে।

হর্স পাওয়ার যে অত সহজে ওকে হাতছাড়া করবে না দুলাল বোঝে। তবু আপাতত রেহাই পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ে, ঠিক আছে, তেমন কিছু ঘটতে দেখলে নিশ্চয়ই জানাব।

তারপর পালিয়ে বাঁচে দুলাল। আরো দিন কুড়ি পঁচিশ ঘরকুনো জীবন কাটিয়ে দেয় ও। সারাদিন দিল্লিদিাল্লি মাল সাপ্লাইয়ের ফিরিস্তি লিখে দিনের শেষে সটান বাড়ি। পাড়ায়ও বেরোয় না। জগদীশের সঙ্গেও আর দেখা হয় না।

আরো কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। আরতি বলল, শুনেছ, দুপুর বেলা খুব হৈ-চৈ গেছে ঘোষবাবুদের বাড়ির সামনে।

—কেন? কি হয়েছে?

—কি আবার হবে। ওই পার্টি! ওই পলিটিক্স।

দুলাল একটু দমে গেল, কারা গোলমাল করল?

—আমি দেখতে গিয়েছিলাম নাকি। প্রথমে খুব হৈ-চৈ, তারপর দুটো চারটে পটকার আওয়াজ, তারপর কেমন সব ঝিমিয়ে গেল, কি যে হল কিছুই ভাল করে বোঝা গেল না।

দুলালের মনে পড়ল, রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ই কেমন যেন একটু থমথমে লেগেছিল ওর। তখন খেয়াল হয় নি, এখন পুরোটাই যেন চোখের ওপর ভেসে উঠছে।

তার মানে, এ কলোনিটাও রেহাই পেল না। এখন খবরের কাগজ খুললেই খুন, রাহাজানি, ট্রেনের তার কাটার হিড়িক রোজকার ঘটনা। সে সব ঘটনার সঙ্গে এতদিন তেমন করে কাটাপুকুরের নামটা জড়ান ছিল না, কিন্তু এখন থেকে বোধহয় এ কলোনিটাও আর রেহাই পাবে না। কেমন গা ছমছম করে উঠল দুলালের।

আরতি বলল, কানাঘুষায় যেটুকু বুঝেছি, জগদীশদের সঙ্গেই নাকি ঝামেলা হয়েছে।

—কে বললে ?

—বলবে কেন ! তুমি বোঝ না ওরা কি ! পাড়ায় যদি কোন ঝমেলা হয় ওদের জন্যেই হবে ।

—এক হাতে তালি বাজে না আরতি । পাড়ায় এখন ঝামেলা বাধাবার লোকের অভাব নেই ।

আরতি আর কথা বাড়ায় নি । দুলালও না ।

আরো কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল । তারপর এল সেই রাত্রি । গভীর রাতে অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে গেল দুলালের । বাড়ির কুকুর বাঘাটা উঠোনের ওপর ছুটোছুটি করে চেঁচাল খানিকক্ষণ । পুকুরের ওপারে কবরখানার দিকেই যেন কিছু একটা ঘটছে । কি ঘটছে, কি ঘটতে পারে ! তবে কি কবর দেবার জন্য কেউ বা কারা এসেছে ওদিকে ! তাদের দেখেই কি বাঘাটা অমনভাবে চেঁচাচ্ছে । কান পেতে খানিকক্ষণ পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করল দুলাল । কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না ।

পাশেই ফুলের স্নিগ্ধতা নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল আরতি । ওকেও ডাকতে সাহস হল না । কাঠ হয়ে বিছানার সঙ্গে লেগে রইল দুলাল । তারপর আবার কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিল ।

ভোরের দিকে চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙতেই দুলাল চোখ কচলাতে কচলাতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে টের পেল, যা ভেবেছিল তাই । খুন, খুন ! কারা যেন কবরখানার ঐ মাঠে জগদীশকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে ।

বিশ্বাসই করতে পারছিল না দুলাল । জগদীশই শেষপর্যন্ত ও-ভাবে জীবন দেবে ভাবা যায় না । কারা খুন করল ওকে ! পাড়ার কয়েকটা রোখাচোখা মুখ চোখের ওপর ভেসে উঠল, কিন্তু না, অসম্ভব ! একজনকে সুস্থ মাথায় খুন করে ফেলা কী এতই সহজ !

জগদীশের রক্তাক্ত নিস্পন্দ দেহটাকে কবরখানার ঝোপের ভিতর থেকে টেনে বার করেছে পুলিস । আর সেই সঙ্গে কলোনির চেহারাটাও

নিমেষে কেমন পালটে গেছে। চোখে মুখে এমন বিভীষিকা আর কখনো দুলাল দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না।

দুলাল বুঝল, এ ঘটনার জের আরো বহুদূর গড়াবে। এখানেই মিটে যেতে পারে না। খুনের বদলা নেওয়া খুন ছাড়া আর কি ভাবতে পারে ওরা। না জানি এবার দুলালকেও কেউ কেউ খুঁজে বেড়াতে শুরু করবে। জগদীশের সঙ্গে অত মাখামাখি করেছে দুলাল, নির্ঘাৎ ওকেও রেহাই দেবে না ওরা।

মুহূর্তের জন্য দুলাল দরদর করে ঘামিয়ে উঠেছিল সে সময়।

॥ ছয় ॥

জগদীশ খুন হওয়ার পর দু'একদিন ও অফিসে গেল না। কিন্তু দিনের পর দিন ঘরে বসে কাটান যায় না। ঘর থেকে পথে পা দিলেই কেবল জগদীশের কথা মনে পড়ে। কারা খুন করল জগদীশকে! যারা খুন করল তারা কি দুলালকেও চেনে। এরপর কি দুলালকে হাতে পাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। অচেনা মুখ দেখলেই দুলাল কেমন চমকে চমকে ওঠে। ওরই দিকে তাকাচ্ছে কেন বারে বারে! কে ও! কি চায় ও!

চোরের মতো পালিয়ে পালিয়ে দুলাল অফিসে গেল কয়েকদিন। অফিস থেকে চোরের মতো পালিয়ে বাড়ি ফিরে এল। পাড়াটা রোজই এত থমথমে লাগে কেন! তবে কি রোজই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে, যা টের পাচ্ছে না দুলাল। কি জানি, কেমন এক আতঙ্ক এসে সারাক্ষণ যেন জড়িয়ে ধরে ওকে। রাতে খুটখাট শব্দ হলেই চোখ ক্যাকাসে হয়ে ওঠে ওর। এই বুঝি বেড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে দুলালকে লক্ষ্য করছে কেউ। এই বুঝি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ির ওপরই হামলা করতে এল কেউ।

অতি মাত্রায় সাবধান হয়ে গেল দুলাল। কোথাও একটু সন্দেহ থাকলেই দুলাল আর সেখানে নেই। কে না জানে, সাবধানের মার নেই।

দুলালের হাবভাব দেখে আরতিও গুম হয়ে গিয়েছিল, এই জন্যই বলেছিলাম, ও-সব লোকের সঙ্গে এত মাখামাখি করো না। তখন তো আর শোন নি।

দুলাল বলে, কিন্তু এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, জগদীশ খুন হতে পারে। আমার চোখের ওপর ওর চেহারাটা এখনো কেমন স্পষ্ট ভাসছে। আর কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না, ভাবাই যায় না।

আরতি বলে, জগদীশকে এখনো তুমি ভুলতে পারলে না।

দুলাল শুধাল, তোমার খারাপ লাগছে না? কত দিন তোমার কাছে চেয়ে তেলেভাজা আর মুড়ি খেয়ে গেছে। কি রকম হা হা করে হাসত, কথা বলত!

আরতি বলল, খারাপ লাগলেই বা কি করা। উপায় তো আর নেই।

দুলাল ছটফট করে উঠল, এ রকম হবে জানলে, মাইরি বিশ্বাস কর, আমি গায়ে পড়ে মিশতে যেতাম না। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। এখন আর কিছু ঘটনা না ঘটে, তাই ভাবছি।

—আর কি ঘটবে?

দুলাল ম্লান হাসবার চেষ্টা করল, না থাক! এখন থেকে আমাদের একটু সাবধানে থাকা উচিত। দিনকাল যে এমন হয়ে যাবে কে ভেবেছিল!

আরতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থেকেছিল। কি জানি, লোকটা কোথায় কি করে রেখেছে। তবু আরতি তর্কের খাতিরেই বলল, তোমার কি, তুমি তো আর পার্টি কর না। যারা পলিটিক্স করে তাদেরই ভয় পাওয়ার কথা।

—ভয়! চমকে উঠেছিল দুলাল। ভয় কি, ভয় পাব কেন?

—তবে অমন করছ কেন?

—কি করেছি ?

আরতি বলল, ঠিক মতো অফিস যাচ্ছো না ! সকাল বেলা বাজারে যেতে চাও না। দরজা জানলা বন্ধ করা নিয়ে মিছামিছি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধালে !

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, সাবধানের মার নেই আরতি। বলা তো যায় না, কখন কি হয়। রাতে কি রকম বোমা ফাটে শুনতে পাও না।

—আমরা তো ও-সবের মধ্যে নেই, আমাদের কি ভয় !

দুলাল ফিসফিস করে, ও-সব ছেলেদের তো চেন না। ওরা বাঁচা মরাটাকে থোড়াই পরোয়া করে।

—কারা ?

—কারা আবার। পাড়ায় দেখ না, কারা পাইপগান নিয়ে, ছুরি বোমা নিয়ে ছুটোছুটি করে।

—মকুরা ?

—আহ্ নাম বলো না। কখন কার কানে যাবে, ব্যাস আর এক ঝামেলা।

আরতি চুপ করে গিয়েছিল।

—মানুষকে ওরা মানুষ মনে করে না আরতি। ওরা নিজেরাও মানুষ না। ওরা আলাদা জীব।

আরতি আর কথা বাড়ায় নি। বাড়িয়ে লাভ নেই। দুলাল যে এক দিক থেকে এখন ঘরকুনো হয়েছে এটাই ভাল। ভাগ্যিস জগদীশের ওই ঘটনাটা ঘটল তবে না ওর হুঁশ হল। মনে মনে স্বস্তিই পাচ্ছিল আরতি। কিন্তু দুলাল কী একটু বাড়াবাড়িই করছে না। দুলাল কি দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ছে না। আরতি আবার কেমন ভাবনায় পড়ল। দুলালের এই মনের অবস্থাটা পালটে ফেলার দায়িত্ব তো ওরই। দুলালের ভাল হোক, মন্দ হোক সবই তো ওকে সইতে হবে।

এই নিয়ে মা ওকে সেদিন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কত না কি বলল। তুমি

কি হলো তো বউমা। ছেলেটা অমন গুম হয়ে আছে তুমি একটু দেখা-শুনা করতে পার না! আরতি বলেছিল, আমি কি করব, আমার কথা শোনে ভারি। মা বলেছিল, তোমার সাধ-আহ্লাদ বলে কি কিছুই নেই, ওকে নিয়ে একটু সিনেমা-টিনেমাও তো যেতে পার। কথাটা সেদিন হজম করে এলেও খুব মনে ধরেছিল আরতির।

পরের দিনই আরতি আবদার ধরে বসল দুলালের কাছে, এই, একটা কথা শুনবে?

দুলাল কাছে এগিয়েছিল, কি?

—চল না গো, একটা সিনেমা দেখি। সেই বিয়ের পর মাত্র একদিন আমরা সিনেমা গিয়েছিলাম। যাবে?

দুলাল তেমন উৎসাহ না পেলেও শেষপর্যন্ত রাজীই হয়ে গেল।

তারপর সেই শনিবারের ঘটনা। বিকেলের দিকে বেশ করে সেজে নিল আরতি। ভ্রূ আঁকল, ঠোঁটে খুব হালকা করে রং মাখল, জামায় আলতো করে সেন্ট ছোঁয়াল। পায়ে আলতা না মাখলে মা খুব রাগারাগি করেন, দুপুরের দিকে এক ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে পায়ে আলতাও মেখে নিল। তারপর দুটো তিনটে শাড়ি বার করে আবদার ধরল দুলালের কাছে, কোনটা পরি বলো তো?

—পর না। যেটা পরবে সেটাতেই তোমাকে মানাবে।

—আহা, বল না। এটা পরব?

—পরতে পার, তবে ঐ হাকোবা না কি বলে ওটাও খারাপ না।

—বড্ড ঝলমল করে ওটা। বরং এই ছাপার শাড়িটাই পরি, পরব?

দুলাল হাসে, তোমার এই কচি কলাপাতা রংয়ের দিকেই ঝোঁক বেশি।

—কেন, রংটা বুঝি খারাপ?

—খারাপ বলিনি! আমারও ও রংটাই ভালো লাগে।

আরতি ততক্ষণে গোলাপী শায়ার ওপর শাড়িটা জড়িয়ে ফেলেছে। ধবধবে ফরসা রং আরতির, শাড়িটা আরো সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলল

ওকে। তারপর নববধূর মর্যাদা রাখার জন্য মাথার ওপর ছোট্ট একটু ঘোমটা টেনে ও মিষ্টি করে হাসল, চলো। সময় হয়ে যাচ্ছে।

—ও কি হল! ঘোমটা কেন?

আরতির চোখে দুষ্টুমি ফুটে উঠল, বড় রাস্তায় গিয়ে যখন বাসে উঠব তখন না হয় ফেলে দেব। চলো তো!

আরতিকে নিয়ে দুলাল বেরিয়ে পড়ল। বেরুবার সময় পকেট হাতড়ে দেখে নিল, হ্যাঁ সিনেমার টিকিটদুটো ঠিকই আছে।

যথা সময়েই ওরা হাউসে এসে বসে পড়ল। পাশে আরতি, দুলাল সত্যি সত্যি রোমাঞ্চ বোধ করতে লাগল। আরতির সিটের ওপর দিয়ে একটা হাত ও ছড়িয়ে দিয়ে আয়েশ করে বসল। আরতির স্নিগ্ধ চুলের মিষ্টি একটা গন্ধ বুক ভরিয়ে দিচ্ছিল দুলালের। মনে হল মানুষ জন্ম নিয়ে এই যে এভাবে বেঁচে আছি এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কী হতে পারে!

সিনেমার শো ভাঙল রাত সাড়ে আটটায়।

হল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে এক পলক দাঁড়াল ওরা। বাসে অসম্ভব ভিড়। এই ভিড়ে লড়াই করতে করতে ফেরার কোন মানে হয়। দুলালই প্রস্তাব দিল, চল না একটু হাঁটি, হাঁটবে?

আরতিও সঙ্গে সঙ্গে রাজী। আমিও হাঁটার কথা বলব ভাবছিলাম। বাসের যা চেহারা ওতে কোন ভদ্রলোক ওঠে না।

ওরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

ইচ্ছে হচ্ছিল, আরতির নরম হাতটাকে মুঠোর মধ্যে তুলে নেয় দুলাল। সাহেব মেম হলে ও-রকমই করত। কিন্তু ওরা একে বাঙালী তায় কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনির লোক। কেমন সংকোচে বাধল দুলালের। তাছাড়া ওদের দুজনকে অনেকেই যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কে জানে, কি ভাবছে।

দুলাল পরোয়া করল না। আরতির মিষ্টি চেহারার দিকে লোকে তাকাবেই। লোকের চোখ তো আর গেলে দেওয়া যায় না।

—কি হল, কথা বলছ না যে? প্রশ্ন করে দুলাল। কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে?

আরতির মুখে অল্প অল্প ঘাম জড়িয়ে পড়েছে। ঘাম, না প্রসাধনের জন্যই মুখটাকে ওরকম দেখাচ্ছে, কে জানে!

আরতিও হাসে, তুমিও তো কথা বলছ না।

—বারে, আমি আবার কি বলব! তুমি বলবে, আমি শুনব।

আরতি চোখের ভাষায় চপলতা মাখায়, কেন আমি শুনতে পারি না?

দুলালের মনে পড়ল, কে বলবে আর কে শুনবে, এই নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি এবারই প্রথম নয়। প্রায় প্রতিদিনই ওদের এরকম ঘটনা ঘটতো। প্রায় প্রতিদিনই এই নিয়ে কত অভিমান, কত চাপা ক্ষোভ আর ক্রোধ।

—ঠিক আছে, আমিই বলছি, আরতি নামে একটি ভারি দুষ্ট মেয়ে ছিল! তার প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কচু বাটা আর শুঁটকি মাছ।

—এই, আমাদের বাড়িতে কখনো শুঁটকি মাছ হত না। ওটা তোমাদের বাড়িতেই আমি শিখেছি।

—আর কচু বাটা?

—কচু বাটা খারাপ বুঝি? খাবার সময় তো চেয়ে চেয়ে খাও।

—না খেয়ে আর উপায় কি! ঝগড়া করতে হলে কচুবাটা খেয়ে গলা ঠিক না রাখলে চলে!

—আমি তোমাদের মতো ঝগড়া করি না।

—কর না আবার! রোজ তুমি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।

আরতি এবারও একটা মোক্ষম জবাব দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে গেল।

—এই যে দুলালদা, ভাল আছেন?

দুলালও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জায়গাটা কেমন নির্জন মনে হল ওর এ সময়। কে আপনি চিনতে পারলাম না তো?

দুলাল দেখল, লোকটার কানের পাতায় কালো কুচকুচে একগুচ্ছ লোম। হিলহিলে লম্বা চেহারা। মাথায় অগোছাল এক ঝাঁক চুল, ঘাড়ের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে। দেখলেই মনে হয় যেন পরচুলা পরেছে। লোকটার দু' আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট জ্বলছে।

—চিনতে পারলেন না! মনে করে দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা?

দুলাল স্মৃতি হাতড়াতে শুরু করল, না, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

লোকটা বিশ্রীভাবে একটু হাসল। গা শিউরে উঠল দুলালের।

—হর্স পাওয়ারের লাইন দিয়ে ভেবে দেখুন, ঠিক চিনে যাবেন।

দুলাল চমকে উঠল। হর্স পাওয়ারের সঙ্গে কোথাও দেখেছি কি! না কি, থানাতে কখনো আলাপ হয়েছিল। অসম্ভব! কখনো কোনদিন এ রকম লোকের সঙ্গে আলাপ হয় নি। হতেই পারে না।

—ঠিক আছে, আপনি একটু এদিকে আসুন।

লোকটা হয়তো কোন গোপন কথা বলতে চাইছে। দুলাল আরতির দিকে তাকাল। আরতি বলল, আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি শুনে এসো না।

—আসুন। লোকটা দুলালকে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেল। আসুন।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছিল দুলাল, আর সেই মুহূর্তেই ও দেখল, লোকটা আঙুলের টোকায় জ্বলন্ত সিগারেটটাকে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। দিয়েই পকেট থেকে বার করল বিলিতি একটা হালকা পিস্তল।

—চেঁচাবার চেষ্টা করবেন না, এটাকে চেনেন তো?

—মানে! এক পলক আরতির দিকে তাকাবার চেষ্টা করল দুলাল। কিন্তু সব কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে।

—শালা, অনেকদিন ডুবে ডুবে জল খেয়েছ। ভেবেছিলে, পার পেয়ে যাবে, তাই না। চলো। এগোও বলছি।

হাতের পিস্তলটা কোমরের পাশে সাঁটিয়ে রাখল লোকটা।

—মানে, আমার স্ত্রী। আমার কি করেছি। আমরা সিনেমায়—

—হ্যাঁ আমরা জানি, তোমরা শালা আজ ফূর্তি করতে বেরিয়েছিলে।

দুলাল অসহায় ভাবটা ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে। আমাদের ছেড়ে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি। ছেড়ে দিন।

জায়গাটা যেন অসম্ভব নির্জন হয়ে পড়েছে। আশেপাশে এমন একটাও লোক নেই, যাকে চিৎকার করে ডাকতে পারে দুলাল। তা ছাড়া ডাকলেই যে কেউ সাহায্য করতে ছুটে আসবে এমনও নয়। দুনিয়ার সব মানুষই কেমন যেন ভীতু হয়ে গেছে।

—এগোও বলছি। বেশি গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করলে এখানেই লাশ ফেলে দিয়ে চলে যাবো।

—আমার স্ত্রী! প্লিজ ছেড়ে দিন।

—তোমার স্ত্রীর গায় কেউ হাত দেবে না। ওকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। এগোও।

দুলালের কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল। আমরা কি করেছি, যে—

—কি করেছ! লোকটা খনখনে গলায় হাসল, যা যা করেছ সে তো তুমিই আমাদেব বলবে। আমরা শুনব। দুলালের ঘাড়ে একটা বদ্দা মারল লোকটা।

দুলাল সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লোকটাই আর এক হাতে দুলালকে দাঁড় করিয়ে দিল। পিস্তলটা এখন ওর অন্য হাতে।

দুলাল চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওর পিঠের কাছে আবাব লোহার নলটা চেপে ধরল লোকটা। চল শালা, চেঁচালে এখনই শেষ করে দেব। চল।

অসহায় দুলাল টলতে টলতে এগোল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?

—গেলেই দেখতে পাবে। সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, জলদি। পিস্তল দিয়ে আবার ঘাড়ের কাছে গুঁতো লাগাল লোকটা।

দুলালের পেটের ভেতর কেমন মুচড়ে উঠল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে

আসতে শুরু করল। চারপাশে বাতাস কি কমে আসছে। রাস্তার আলোগুলি কি ওরাই নিভিয়ে দিয়েছে, এত অন্ধকার কেন?

কিছুক্ষণ পর আবার ওর আরতির কথা মনে পড়ল, আরতি কোথায়! পিছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করল, আরতি, আরতি কোথায়?

—ওকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। বেশি বেগরবাই করলে ওকে বিধবা, বিধবা বোঝ, ওকে বিধবা বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে।

দুলাল অনুমানে বুঝল, ওর কাপড় ভিজে যাচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি।

কিন্তু লোকটা ততক্ষণে আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে, থুক করে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দিল দুলালের গায়। শালা, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না।

একটা বস্তির পাশ দিয়ে ওরা এগিয়ে গেল, সামনেই রেল লাইন। এটা কি লক্ষ্মীকান্তপুরের লাইন। দুলাল জায়গাটা কিছুই চিনতে পারছিল না। এ কোন জায়গায় ওরা ওকে নিয়ে চলেছে। বহুদূরে রক্তচক্ষু একটা সিগন্যাল জ্বলছে। লাইনের ধারে জল বিছুটির জঙ্গল। কিন্তু সেই জঙ্গলের দিকে না এগিয়ে বাঁ দিকে ওকে এগোতে বলল। বাঁ দিকে একটা ভাঙা ইটের পাঁচিল, পাঁচিলটাকে টপকাতে হল। মনে হল যেন একটা বাগানবাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকছে ওরা। বিরাট বিরাট সব গাছ, আর অন্ধকার জমে আছে ওখানে। সামনেই একটা পুকুর চোখে পড়ল, আলকাতরার মতো জল। কালো।

পুকুরের ওপারে একটা ভূতে পাওয়া নিস্তব্ধ পোড়ো বাড়ি। লোকটা মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করতেই হঠাৎ বাড়ির ওপাশ থেকে একটা টর্চের আলো এসে ওদের গায়ে পড়ল।

লোকটা আবার একটা রদ্দা মারল দুলালের কাঁধে, চল শালা, এসে গেছি। দুলালের গা বমি-বমি করে উঠল। সারা শরীর প্রচণ্ডভাবে ঘামতে শুরু করল। ঐ বাড়িটার মধ্যে দুলালকে ঢুকিয়ে ওরা কি ওকে খুন করবে? মুখের ভেতর এক ঝলক নোনতা জল উথলে উঠল দুলালের।

ওপাশ থেকে কে যেন ওদেরই উদ্দেশ্যে জানতে চাইল, কি রে, এনেছিস

লোকটা হি হি করে হেসে উঠল, এনেছি। বাবু হিসি করে কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। চল শালা—

ঠেলে বাড়ির একটা ঘরের ভিতর দুলালকে ঢুকিয়ে দিল লোকটা। দুলাল বুঝল, আরো কয়েকজন রয়েছে সেখানে। দুটো মোম জলছে, সেই মোমের আলোয় কেমন অস্পষ্ট একটা ভূতুড়ে পরিবেশ। দেয়াল নোনাধরা। কেমন স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ। কতকাল যেন এ ঘরে কেউ বাস করে নি।

ঘরের ভিতর একপাশে ডাঁই করা রয়েছে যত রাজ্যের আবর্জনা। একটা জংধরা লোহার চেয়ারও চোখে পড়ল দুলালের। চেয়ারের পিছনে দু'হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যে লোকটা তার চেয়ালের কাছে অদ্ভুত একটা কাটা দাগ! দাগটার দিকে চোখ পড়তেই কেমন চমকে উঠল দুলাল। একটা কাঁকড়া যেন ওখানে হালকাভাবে লেগে আছে। লোকটার একটা চোখ একটু ছোট মনে হল দুলালের। আসল ক্রিমিন্যাল বলতে যা বোঝায়। কি চায় এরা!

না, এ লোকটাকেও দুলাল কোনদিন দেখে নি। আর ওপাশে দরজার কাছে আর একজন। টর্চ হাতে লোকটা বোধহয় দরজার বাইরে রয়েছে।

—কি বে দুলাল? ভেবেছিলি কোনকালে দেখা হবে না, না?

দুলাল ডুকরে উঠল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! আ-আ-আমি—

—বুঝতে পারছিস না, না! শালা টিকটিকি কোথাকার! চেয়ারের পেছন থেকে লোকটা ধাঁ করে দুলালের সামনে এগিয়ে এসে দুম করে ওর পেটে একটা লাথ বসিয়ে দিল।

উলটে পড়ল দুলাল। দেয়ালে ওর মাথা ঠুকে গেল। 'মাগো' বলে চিৎকার করে উঠতেই দরজার পাশ থেকে ছেলেটা ড্যাগার তুলে ধরল ওর দিকে। এই শালা, চুপ।

দুলালের চোখের ডিমদুটো যেন উত্তেজনায় ভয়ে ফেটে বেরিয়ে আসছে। হাঁটুদুটো থরথর করে কেঁপে উঠল ওর।

—জগদীশের খবর কে দিয়েছিল থানায়? বল, বল শালা? আবার ওর বুকের ওপর একটা লাথি ছুঁড়ে দিল লোকটা।

দুলাল এতক্ষণে খানিকটা যেন আঁচ পেল কি হয়েছে। আমি, আমি জানি না। দুলাল জোর হাত করে প্রাণ ভিক্ষা চাইল, আমি না, আমি কিচ্ছু জানি না। আমাকে মারবেন না। আমি—

—তবে ওকে ওভাবে মারল কেন পুলিস? শালা।

—পুলিস! দুলাল কেমন গোলমালে পড়ে গেল। পুলিসে মেরেছে, অসম্ভব! ওকে কবরখানায় পাওয়া গেছে। পরদিন সকালে এসেছিল পুলিস।

—আবার শালা চালাকি করছিস! এবার ডাক তোর কোন বাবা তোকে বাঁচায়। ডাক শালা।

দুলাল আবার ককিয়ে ওঠে, আমি সত্যি বলছি, মায়ের নামে দিব্যি কেটে বলছি, কিছু জানি না। জগদীশ আমার বন্ধু ছিল। আমিও ওর সঙ্গে—

—হ্যাঁ শালা, ওর সঙ্গে মিশতিস খবর বার করার জন্য। বল শালা, আর কি কি খবর দিয়েছিস?

দুলাল হাত বাড়িয়ে লোকটার পা জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল, বিশ্বাস করুন, আমি না। আমি কিছুই জানি না।

—হর্স পাওয়ারের সঙ্গে আলাপ নেই তোর?

—কে? দুলাল ঢোক গিলল।

—হর্স পাওয়ার বে, হর্স পাওয়ার।

—চিনি না। সত্যি বলছি চিনি না।

—চিনিস না। এই ভোজালি দেখছিস? কাল সকালে তোর লাশও পাওয়া যাবে ঐ কবরখানায়।

দুলাল আবার পা জড়িয়ে ধরল লোকটার।

আর এসময় সেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটে গেল। দুলাল ভাবতেই পারে না, আরতিও এই নির্জন ভূতুড়ে বাড়ির কাছে চলে আসবে। ঘরের বাইরে আরতির চিৎকার শুনে চমকে উঠল দুলাল। আরতিকেও কি ওরা মারতে মারতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আরতির কি দোষ!

ঘরের লোকগুলি কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, ঝট করে আবর্জনার ভেতর থেকে দু হাতে একটা পাইপ গান তুলে নিয়েছে চোয়াল কাটা লোকটা। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল আর একটা নতুন মুখ। মাইরি বুবুদা মেয়েটা শালা কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ল না। নেহাত মেয়ে, তাই গায়ে হাত দিই নি।

—আর কিছু হয় নি তো? মুখের সেই কাটা দাগ-অলা লোকটাই যে বুবু, বোঝা গেল।

নতুন লোকটার একটা হাত নেই। কনুইয়ের কাছ থেকে হাতটা কাটা। গলা মোমের মতো মাংস পিণ্ড জমে আছে কনুইয়ের কাছে। বাকি আর একটা হাতে একটা ড্যাগার।

হাতকাটা লোকটা বলল, ও এসেছে বটে, তবে কেউ টের পায় নি। আমি ভাল করে লক্ষ্য রেখেছিলাম।

আরতি ততক্ষণে ঝাঁপিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ও কী সাংঘাতিক চেহারা হয়েছে আরতির। কে বলবে, আরতি সাজগোজ করে ছিমছাম হয়ে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। ওটা কি আরতির মুখ, আরতি কী ঐ শাড়িটাই পরে বেরিয়েছিল!

দুলালের চোয়ালদুটো ফাঁক হয়ে গেল, অদ্ভুত একটা পশুর শব্দ বেরুতে লাগল ওর গলা দিয়ে।

—আপনি এসেছেন কেন? জানেন, কোথায় এসেছেন? বুবুর গলার স্বর ভয়ানক ভারি শোনাল।

আরতি আছড়ে পড়েছে মেঝেতে। ছেড়ে দিন, ওকে ছেড়ে দিন। আপনাদের পায়ে পড়ি, ওকে ছেড়ে দিন।

দুলালও ককিয়ে উঠল, ছেড়ে দিন।

—ছেড়ে দেব। শালা, টিকটিকি হওয়ার সময় মনে ছিল না। চোপ!

—ওকে ছেড়ে দিন। আবার মাথা ঠুকল আরতি। আপনাদের পায়ে পড়ি।

এমন সময় সেই কানে চুল-অলা লম্বা হিলহিলে লোকটা এগিয়ে এল, ঠিক আছে ছাড়তে পারি, একটা শর্তে।

দুলালরা একটু থমকে গেল। অকূল সমুদ্রে কোথাও যেন একটু ডাঙার চিহ্ন চোখে পড়ছে। প্রচণ্ডভাবে জিজ্ঞাসুচোখে ওরা তাকিয়ে থাকল।

কিন্তু তখনই শর্তটা আরোপ করল না ওরা। লম্বা লোকটা বুবুর কাছে এগিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলল। পরামর্শ করল।

বুবুই এরপর তার নোংরা পায়ের আঙুল দিয়ে দুলালের চোয়ালে একটা ঠোকা মারল, ছাড়তে পারি একটা শর্তে। তোর বউটাকে শালা জামিন রেখে যেতে হবে।

দুলালের মনে হল, অতল সেই সমুদ্রে হঠাৎ ডাঙা চোখে পড়লেও সেখানে অসংখ্য বিষধর সাপ কিলবিল করছে। ডাঙায় পা রাখবার জায়গা কোথায়! দুলাল আবার ককিয়ে উঠল, আপনাদের পায়ে পড়ি। মরে যাবো। মাগো—

এমন সময় আশ্চর্য, আরতিই কঠিন হয়ে উঠল, ঠিক আছে, আমিই থাকব। ওকে ছেড়ে দিন।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা।

দুলাল কেমন কেন্নো-পোকার মতো গুটিয়ে এইটুকুন হয়ে গেল।

—ঠিক আছে, ছেড়ে দে শালাকে! তবে—

দুলাল অসহায়ভাবে আরতির দিকে তাকাল। আরতি কি ওকে উঠে যেতে ইঙ্গিত করছে, বুঝতে পারল না।

—তবে শালা, যদি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চাস, নাকে খত দে শালা, জীবনে আর পুলিসের লেজ ধরবি না, বল।

দুলাল বুঝতে পারছিল না আরতির কি হবে! আরতিকে কি একটু পরেই ওরা ছেড়ে দেবে।

—নাকে খত দে শালা।

দুলালের ঘাড় ধরে মাটিতে দু'বার ঠুকে দিল সেই লম্বা লোকটা তারপর হিঁচড়ে দুলালকে টেনে এনে দরজার বাইরে ছুঁড়ে দিল।

—যাহ্ শালা। হ্যাঁক থু—

দুলাল অন্ধকারে সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর সিঁড়িতে ভর দিয়েই উঠে দাঁড়াল, বিশ্বাসই করতে পারছে না, ও ছাড়া পেয়েছে, ও বেঁচে আছে। রাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ওর গায়ে লাগে। সামনে সেই নিস্তরঙ্গ আলকাতরার মতো পুকুরটা। চারপাশে কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে বিশাল বিশাল গাছগুলো। একবার ও ঘরের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর হালকা পায়ে খানিকটা এগোল। না, কেউ ওকে বাধা দিচ্ছে না। ও বেঁচেই আছে, এই তো ও হাঁটতে পারছে। নিজের ইচ্ছেমতো ও হাত-পা নাড়তে পারছে।

দুলাল বুঝল, আর অপেক্ষা করা বোকামি। ও ছুটতে শুরু করল। জীবন বড় দায়। ভুলে গেল আরতির কথা, ভুলে গেল নিজের মান-অপমান, লাঞ্ছনা, সম্মান-অসম্মানের কথা।

ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ও যখন বাড়ি এসে পৌঁছল ঘড়িতে তখন রাত একটাও বেজে গেছে।

॥ সাত ॥

শনিবার রাতে এই সব ঘটে গেছে। আজ মঙ্গলবার। আজ ভোরের দিকে কাকপক্ষী টের পাওয়ার আগেই ফিরে এসেছে আরতি। ফিরে এসে মায়ের মনে সন্দেহটা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। সারাটি দিন এসব নিয়ে খুব একটা উচ্চবাচ্য না হলেও দুলাল বুঝতে পারে, মায়ের চোখেমুখে প্রচণ্ড ঘৃণা। অথচ মাকে বোঝান যাবে না। মাকে কোন কিছুই খুলে বলতে পারবে না দুলাল। বলা সম্ভব নয়।

এই তিনটে দিন প্রচণ্ড এক অপরাধ-বোধ কুরেকুরে খেয়েছে দুলালকে। সেই সঙ্গে ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে জড়িয়ে ছিল আতঙ্ক। ঘরের বাইরে এক পাও বেরুতে সাহস পায় নি দুলাল, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে একটা খবর জানানোও সম্ভব হয় নি। বিনা খবরে ও কামাই করেছে, না জানি শেষ পর্যন্ত চাকরিটাই ওর হাতছাড়া হয়ে গেছে। চাকরি যদি যায়, দুলাল এবার পথে বসবে।

এ তিনদিন সারাক্ষণ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটেছে ওর। পেট ভরে ভাত খাওয়া দূরের কথা, রাতের ঘুমও চলে গিয়েছিল। আরতিকে ও-ভাবে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা, কেমন করে এটা মেনে নিল দুলাল। দুলাল কী সত্যি সত্যি এত কাপুরুষ! দুলাল কী নিজের বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না! তাই যদি হবে, তাহলে এই তিন দিন এত অস্থির হয়ে কাটাল কেন ও। কেন ও এ'কদিন ঘুমুতে পারে নি, খেতে পারে নি। কেন ও এক পাও ঘর থেকে বেরুতে পারে নি!

অথচ এই তিন দিনে ওর উচিত ছিল আরতিকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করা। নিজের ক্ষমতা বা সাহস বলতে ওর কিছুই নেই, ওর হাতে যদি রাইফেল থাকত তাহলেও দুলাল ওদের সঙ্গে লড়তে পারত না। মারদাঙ্গা করে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয়, দুলাল তা জানে না। সে সাহসও ওর নেই। কিন্তু যদি সেই রাতেই ও বড়বাবুদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারত, হয়তো একটা কিছু হতে পারত। রাতের অন্ধকার হলেও দুলাল কি সেই বাগান বাড়িটাকে আর একবার খুঁজে বার করতে পারত না। নির্ঘাৎ খুঁজে বার করে ফেলত দুলাল।

কিন্তু না, এই তিনদিন ধরে হাজারবার ও ভেবেছে, পুলিসের সাহায্য নেবে কি নেবে না। পুলিসের কাছে যাওয়া মানেই আবার বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়ান। বুবুরা যদি টের পায়, পুলিস নিয়ে ওদের পিছনে লেগেছে দুলাল, আরতিকে ওরা ছাড়বে না। পুলিসের সঙ্গে দুলালের যোগ আছে কিনা সেটা ভাল করে যাচাই করার

জন্যই তো ওরা আটক রেখেছে আরতিকে। এ অবস্থায় পুলিসের সাহায্য নিলে, তার ফল কি ভাল হতো! আরতির কিছু একটা হয়ে যাওয়া তো এক মুহূর্তের ব্যাপার। পুলিস আর কতক্ষণ ওদের আগলে থাকতে পারে। সম্ভব নয়, চিরকাল প্রতিটি মুহূর্ত পুলিস ওদের আগলে থাকবেই বা কেন!

দুলাল কিন্নে-পোকার মতো গুটিয়ে গিয়েছিল এ ক'দিন। কী কুক্ষণেই যে ও চায়ের দোকান করতে গিয়েছিল, কী কুক্ষণেই যে সেখানে হর্স পাওয়ারের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল। বুবুদের কথা শুনে স্পষ্ট বুঝেছে দুলাল, ওরা হর্স পাওয়ারকেও চেনে। তেমনি ওরা দুলালের খবরও রাখে। কেমন করে যে এটা সম্ভব হল, কিছুতেই মাথায় ঢোকে না ওর।

আর যাই হোক, দুলাল যেন পুনর্জন্ম পেয়েছে। বুবুরা তো নেহাতই দয়া দেখিয়ে ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলল না। ওরা তো সেই একই ভাবে দয়া দেখিয়ে আরতিকেও ছেড়ে দিতে পারে। আরতির কি দোষ! আরতি তো পুলিসের কাউকেই চেনে না, আরতি তো রাজনীতি নিয়ে মাতামাতিও করে না। তবে কেন আরতিকে ওরা ছেড়ে দেবে না? এই তিন দিন প্রতিমুহূর্তে মনে হয়েছে এই বুঝি আরতি ফিরে এল। এই বুঝি আবার ওদের ঘরখানা আরতির সাড়া পেয়ে ভরাট হয়ে গেল।

কিন্তু না, বৃথাই কেবল নিজের মধ্যে গুমরে মরা। বৃথাই কেবল নিজের অপদার্থতার কথা ভেবে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা।

অবশেষে সত্যি সত্যি সমস্ত উত্তেজনাকে চরমে উঠিয়ে ফিরে এল আরতি। তারপর সারাটি দিন কী এক অসম্ভব থমথমে অবস্থার ভিতর কেটেও গেল। সারাটি দিন আরতি আজ বিছানায় পড়ে পড়ে ফুঁপিয়েছে, কেঁদেছে। কখনো নির্জীব ঘুমের ভান করে কাটিয়ে দিয়েছে! কখনো হাঁটু মুড়ে বসে মুখ নিচু করে বসে থেকেছে। দুলাল কত বার এগিয়ে গিয়েও আপনজন হতে পারে নি আরতির। কি কথাই

বা ওকে শুধোন যায়! আরতি যদি নিজে থেকে কিছু না বলে, কাপুরুষ দুলালের পক্ষে কতটুকুই বা সম্ভব। আরতির শুকনো ভাঙাচোরা মুখ-খানার দিকে তাকাবার মতো সাহসও যেন হারিয়ে ফেলেছিল দুলাল।

কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনিতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল। বেড়ার ওপাশে ছুটোছুটি করে কুকুর চেঁচাল অনেকক্ষণ। সামনের পানাভর্তি পুকুরের দিক থেকে বিনবিন করে কোটি কোটি মশা উড়ে এসে ঘিরে ধরল সমস্ত কলোনিটাকে। সামনের রহস্যময় কবরখানার দিকটায় ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার। দূরে হিন্দুস্থানী গোয়ালাদের খাটালে প্রাত্যহিক নিয়মে খোল-কর্তাল আর ঝাঁঝর নিয়ে তারস্বরে চেঁচানি শুরু হয়ে গেল।

দুলাল বারান্দায় বসে জবুথবু বৃদ্ধের মতো কাটিয়ে দিল অনেকক্ষণ। ওদিকে রান্নাঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখে আগামীকালের কুটনো কুটতে বসেছিলেন মা। এটা প্রীতিলতার প্রাত্যহিক অভ্যাস। সারাদিন আজ প্রীতিলতা বিড়বিড় করে বকে গেছেন। দুপুরে ভাতের থালা রান্নাঘরে ফেলে রেখে এসে দুলালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিলেন, যা মহারাণীকে বল্ গিলে আসতে।

আরতি ওঠে নি। দুলালই আরতির হাত ধরে টেনে তুলেছিল, ওঠো, খেয়ে নেবে এস!

আরতির কান্না যেন আরও উথলে উঠেছিল।

দুলালই আরতির পিঠে সান্ত্বনার হাত বিছিয়ে দিয়েছিল, মায়ের কথায় রাগ করে না, মাকে তো তুমি চেনই। ওঠো, লক্ষ্মীটি।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর আরতিকে জোর করে কিছুটা খাওয়াতে পেরেছিল দুলাল। তারপর আবার যথাবিহিত নীরবতার মধ্যে কেটে গেল দিনের বাকি সময়টুকু।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নিস্তব্ধতা বিছিয়ে পড়ল। কবর-খানার দিকে জটিল অন্ধকার আশ্রয় করে রহস্যময়তাকে আরো বাড়িয়ে তুলল। রাতের অন্ধকারে আশ্রয় না পাওয়া দুটো-একটা পাখি মাথার

ওপর দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে উড়ে গেল। বহুদূর থেকে দু'বার-একবার বোমা ফাটার শব্দ কানে ভেসে এল দুলালের। কারা ফাটাচ্ছে ওসব, কেনই বা ফাটাচ্ছে! আবার কোথায় কোন সর্বনাশ ঘটে যাচ্ছে, কে জানে!

দুলাল নিজের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। এ বেলা আর আরতিকে ডাকতে হল না। আরতি নিঃশব্দে উঠে পুকুর ঘাটে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল. অযাচিতভাবেই ঘরের টুকিটাকি কিছু কাজ সারল। দুটো ঘরই ঝাঁট দিয়ে ময়লা জমিয়ে রাখল কোণায়, দরজার দিকে। তারপর আপন মনে রান্নাঘরে ঢুকল। পেছনে পেছনে এগিয়ে এসেছিল দুলাল, আরতি কথা বলে নি। কথা বলার প্রয়োজন মনে করে নি; সব কথাই যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর আরতি আপন মনে সামান্য কিছু ভাত বেড়ে খেয়ে নিয়ে নিত্যকার নিয়মে রান্নাঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে চলে এসেছিল।

প্রীতিলতা অনেক আগেই দরজায় খিল তুলে শুয়ে পড়েছিলেন। আরতিও আর দুলালের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করল না, ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল।

দুলাল আরো কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে কবরখানার দিকে তাকিয়ে থাকল, মশার দাপটে অস্থির হওয়ার যোগাড়। ধীরে ধীরে উঠে পড়ল ও। ঘরে ঢুকল। লণ্ঠনটা নিস্তেজ হয়ে জ্বলছে। চিমনিতে বেশ কিছু কালি জমেছে। এ ক'দিন লণ্ঠনে তেল ভরা বা চিমনি পরিষ্কার করার কথা কারোরই মাথায় আসে নি। দুলাল দরজায় খিল তুলে বিছানার দিকে তাকাল একবার। মশারিটা ফেলে দেওয়া দরকার। লণ্ঠনটাকে খাটের কাছাকাছি রেখে নিভিয়ে রাখা দরকার। অনেক দিন ধরেই একটা টর্চ কেনার কথা মাথায় ঘুরছিল দুলালের, কিন্তু সে আর হয়ে ওঠে নি। আজ সেই টর্চের অভাবটা বড্ড বেশি করে মনে পড়তে লাগল ওর।

দুলাল এগিয়ে এল, মশারি ফেলবে না? প্রশ্ন করল।

আরতির কোন সাড়া নেই। মশার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই বোধ হয়, এই গরমেও গায়ের ওপর একটা চাদর বিছিয়ে রেখেছে ও।

দুলাল আরো কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষায় থাকল। তারপর লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে খাটে উঠে মশারি ফেলে দিল।

জমাট অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মশারি গুঁজল দুলাল। আরতির কোন ভাবান্তরই নেই। দুলাল আরতিকে ডিঙিয়ে ও পাশের মশারিও গুঁজে দিল। পরে পাথরের মতো জমাট হয়ে বসে রইল।

নিঃসীম স্তব্ধতা চারপাশে। দাপনার বেড়ার ওপাশে মা কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? মায়ের কাছে পরিষ্কার কে' ঘটনাগুলো কি খুলে বলা উচিত ছিল দুলালের? মাকে যদি বোঝান যেত, মা কি তাহলে আরতিকে ক্ষমা করত না? আরতির কি দোষ? বরং আরতির জন্যই তো দুলাল এ যাত্রা প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে। যত লাঞ্ছনাই সহ্য করুক, আরতিও তো আবার ওদের কাছেই ফিরে এসেছে। এখন কি ওরা শনিবারের কথা ভুলে যেতে পারে না?

দুলাল ঠিক করল, মন থেকে সেই কুৎসিত ঘটনার কথা মুছে ফেলবে। মার কাছে কেন, আর কারো কাছেই ওরা নিজেদের গোপন অধ্যায়ের কথা প্রকাশ করবে না। কক্ষনো না।

—আরতি! খুব মিহি গলায় ডাকল দুলাল।

আরতি তেমনি নীরব।

দুলাল একটু ঝুঁকে অন্ধকারে আরতির গায়ে হাত রাখল। তোমার গরম লাগছে না? মশারি ফেলে দিয়েছি, চাদরটা সরাও না।

গা থেকে দুলালের হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল আরতি।

আবার স্তব্ধ হয়ে গেল দুলাল। আরতি কি ভুলতে পারছে না? এই তিন দিন আরতিকে নিয়ে ওরা কি করেছে! কি করতে পারে ওরা! আরতি কি সে সব কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না!

—আরতি! আবার ডাকল দুলাল।

আরতি কিছুটা নড়েচড়ে উঠেছে, বুঝতে পারল কিন্তু হাত বাড়াতে আর সাহস পেল না দুলাল।

—মন থেকে ওসব কথা মুছে ফেল আরতি। আমি জানি কি হয়েছে। দু'-একদিন গেলে মাও ঠিক হয়ে যাবে। আরতি!

আরতি কি আবার কাঁদতে শুরু করল? মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল দুলালের। আরতি কাঁদছে কেন! দুলাল প্রতিশোধ নেবার কথা বলছে না দেখে কী! কিন্তু আরতির তো বোঝা উচিত, ওরা কী সাংঘাতিক! ওরা মানুষ হয়ে জন্মেছে ঠিক, কিন্তু ওরা মানুষ নয়। মানুষ হলে মেয়েদের সম্মান দিতে ওরা ভুল করত না। ওরা দুলালের সঙ্গে আরতিকেও ছেড়ে দিত।

—তুমি কাঁদছ? যদি এই ভাবে কাঁদতে থাক তাহলে বুঝব, তুমি আমাকে ভুল ভেবেছ। বিশ্বাস কর আরতি, আমি ওসব কথা ভুলে যেতে চাই।

আবার স্তব্ধতা নেমে এল, দূরে আবার কোথাও যেন বোমা ফাটছে। বোমা না অন্য কিছু। কি জানি, পৃথিবীর লোকগুলি হঠাৎ এমন করে উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন! কী ভয়াবহ রাত্রি নেমে এল আজ!

ভীষণ গরম লাগতে থাকে দুলালের। ঘরের সব কটি জানালাই বন্ধ। দরজাও। গুমোট গরমের মধ্যেই এই অদ্ভুত রাতটাকে ওদের কাটাতে হবে। মনে পড়ল, শোবার সময় হাত-পাখাটা মশারির মধ্যে নিয়ে ঢোকে নি ও। অত কিছু মনে রাখাও সম্ভব নয় দুলালের। অসহায়ভাবে আবার ও অন্ধকারে হাত বাড়াল আরতির দিকে।

—কি চাও?

আরতির গলার স্বরে চমকে উঠল দুলাল। এ কোন্ আরতির কণ্ঠস্বর! দুলাল হাতটাকে টেনে নিল।

—তুমি রাগ করেছ আরতি?

—রাগ, কেন? কার উপরে করব?

দুলাল উত্তর খুঁজতে লাগল, না, মানে, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আরতি।

আরতির দেহটা বোধহয় আবার নড়াচড়া করছে, আরতি কি পাশ ফিরছে? দুলাল স্থির হয়ে অপেক্ষা করল।

—ভুল বুঝব কেন! তুমি যা তাই বুঝেছি।

আরতি কি কাপুরুষ শব্দটা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না? আরতি কি করুণার দৃষ্টিতে দেখছে দুলালকে? হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক। দুলালের মনে হল, ও বড্ড ভুল করেছে। বুবুদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই ওর থানায় ছুটে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো সেদিন রাতেই পুলিস ফোর্স নিয়ে আরতিকে উদ্ধার করে আনা যেত। হয়ত এরকমই কিছু হবে বলে আশায় আশায় বসে ছিল আরতি।

দুলাল ক্ষীণ গলায় বলল, ওরা তোমায় খুব কষ্ট দিয়েছে আরতি?

—কই! আরতি অদ্ভুত একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে।

—না, মানে, ওরা তোমাকে ঐ বাগানবাড়িতেই আটকে রেখেছিল?

—শুনে কোন লাভ আছে? পালটা প্রশ্ন করল আরতি।

—না, মানে, আমার ধারণা ছিল ওরা তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেবে। আমাকে ছাড়ার পর ওরা তোমাকে ওখানে আটকে রাখতে সাহস পাবে না।

—তোমার ধারণার সঙ্গে মিলল না তা হলে।

দুলাল বুঝল, আরতির গলায় এখনো জ্বালা মিশে আছে। সে জ্বালা প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছে না ও। ফলে আবার একটু চুপ করে থাকল দুলাল। কথা হাতড়াতে শুরু করল।

—ওই বাগানবাড়ির ঘরটাতেই তোমাকে আটকে রাখল? তোমাকে বেরুতে দেয় নি?

—না।

—দিন রাত ওঘরেই? তুমি খাও নি কিছু?

—খেয়েছি।

—তোমাকে খেতে দিল?

—কেন, তোমার ধারণা কি ছিল?

আবার একটা হোঁচট খেল দুলাল। কিন্তু আরতির যত ইচ্ছা ওকে গালাগালি করুক, দুলাল রাগবে না। দুলাল যে আরতিকে আবার ফিরে পেয়েছে এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী থাকতে পারে ওর।

—ধারণার কথা বলছ, আমি জানতাম, ওরা যত জঘন্যই হোক, তোমাকে খেতে দেবে।

—কেন, আমি তো তোমার ভাষায় সুন্দরী। সুন্দরী বলে ?

—তুমি আমার চোখে সত্যি সত্যি সুন্দরী। তোমার জন্য এখনো আমি মনে মনে গর্ব করি।

—আর কিছু কর না ?

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, তুমি ভাবতেই পারবে না, এ ক'দিন কত দুশ্চিন্তায় আমার সময় কেটেছে। আমি কিন্তু এক কণা ভাতও মুখে দিতে পারি নি। রাতে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমুতে পারি নি। সারাক্ষণ কেবল পথ চেয়ে থেকেছি, এই বুঝি তুমি এলে! বাইরে একটু শব্দ হলেই উঠে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছি।

আরতি নীরব হয়ে গেল।

দুলাল উৎসাহ পেয়ে বলল, আমার মনে হয়েছিল, ওরা তোমাকে আটকে রেখে দেখতে চাইছিল, আমি পুলিসের সাহায্য নিই কি না। পুলিসের সঙ্গে আমার যে কোন যোগাযোগ নেই সেটাই আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।

—ওরা পুলিসকে তোয়াক্কা করে না। তুমি পুলিস নিয়ে গেলেও ওরা ভয় পেত না। ওরা ওদের মতো থেকেছে। আমার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করা দরকার ওরা তাই-ই করছে।

—তোমার সঙ্গে ওরা খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আরতি ? দুলালের এ সময় অদ্ভুতভাবে স্বরভঙ্গ হল।

—সে সব শুনলে তোমার খুব ভাল লাগবে না। তুমি বরং ও ঘরে যাও, মায়ের পাশে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। কেন আমাকে বিরক্ত করতে এলে বলো তো ?

—মিছিমিছি আবার আমাকে ভুল বুঝছ আরতি। তখন দেখ নি, তোমার হয়ে আমি মায়ের সঙ্গে কত ঝগড়া করলাম। আমার সামর্থ্য ছিল না তোমাকে আমি ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনি। তাছাড়া সেই লম্বা লোকটা যখন আমাকে ধরে নিয়ে গেল, তুমি কেন বাড়ি ফিরে গেলে না? তুমি নিজে কেন ওদের হাতে ধরা দিতে গেলে?

—আমি তোমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।

—আমি মরলেও কিছু আসত যেত না।

—আমি তা মনে করি নি। তোমাকে ছাড়া আর কিছুই তখন আমার ভাববার ছিল না।

দুলাল উত্তেজনায় আবার একটা হাত এগিয়ে দিল আরতির দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাতটাকে আবার ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিল আরতি।

আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল দুলাল। খাটের নিচে ইঁদুর কিংবা আরশুলা ছুটোছুটি করছে, টের পেল ও। ঘরের বাইরে এখনো কি অন্ধকার, না চাঁদ উঠেছে এরই মধ্যে! দুলাল গুছিয়ে কিছু ভাবতে পারছে না। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ওর। শয়তানরা এই তিনটি দিন আরতিকে আটকে রেখে কি করেছে? কি করতে পারে ওরা? অথচ সে সব কথা জিজ্ঞেস করতেও আতঙ্কে সিঁটিয়ে ওঠে দুলাল। হয়তো ও এমন কিছু শুনবে, যা কল্পনা করাও কঠিন।

তবু কৌতূহল দমিয়ে রাখা দায়। দুলাল প্রশ্ন করল, সত্যি সত্যি ওরা তোমাকে আটকে রেখে কী করেছে আরতি? বল না ওরা কী করল?

—কী করেছে, আমার চেহারা দেখে বোঝ নি? তোমার মা তো কতবার আমাকে শাড়ি জামা পালটে নিতে বললেন, শোন নি সে কথা?

—যাহ্, তুমি আমাদের উপর রেগে আছ, ঐ কথা বলে রাগ মেটাতে চাইছ।

—বলেছি তো, আমাকে বিরক্ত করো না। হয় ঘুমোও, নয় ও ঘরে মায়ের সঙ্গে বসে বকবক করো। আমাকে জ্বালাতে এলে কেন?

—তুমি রাগ করো না আরতি। আমার মনের অবস্থা কী তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না!

আরতি হঠাৎ এবার নড়েচড়ে পাশ ফিরল। কে জানে, বুকের কাছে বালিশটা টেনে নিয়ে ঘাড় তুলে ধরল কি না। ছুলালের অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

—ওরা আমার কি করেছে জানতে চাইছ, না? বেশ, ওঠো, ডেকে নিয়ে এসো তোমার মাকে, সবার সামনেই বলব। সব কথা বলব। যাও, ওঠো। হঠাৎই হাত বাড়িয়ে আরতি ধাক্কা দিল ছুলালকে, যাও।

ছুলাল আবার কেমন প্রচণ্ড অপরাধবোধে গুটিয়ে গেল। না আরতি, তুমি ঘুমোও। আমি আর জানতে চাই না। একদম না। তুমি ঘুমোও।

আরতি আবার সরে গেল। বিড়বিড় করে ওর ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে এল, কাপুরুষ। কাপুরুষের চেয়েও অধম।

নিস্পন্দ চোখে তাকিয়ে থাকল ছুলাল। চোখের ভেতরে বাইরে ছুদিকেই তখন অন্ধকার। প্রচণ্ড শ্বাসরোধ করা অন্ধকার।

॥ আট ॥

এমনি এক নিঃসীম অন্ধকারের মাঝে ওরা তিন-চারজনে মিলে আরতিকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল রেল-লাইনের ওপর। আরতির তখন অসাড় দেহ, সমস্ত স্নায়ুগ্রন্থি কেমন নির্জীব। তখন কি জ্ঞান ছিল ওর, মনে করতে পারে না আরতি। হয়তো ছিল, অতি সামান্য। ওকে যখন আছড়ে রেল-লাইনের ওপর ওরা শুইয়ে দিল, লাইনের হিমশীতল কঠিন স্পর্শে আরতি তখন অদ্ভুত কিছু কাতর শব্দ করেছিল বোধহয়।

ওরা চারমূর্তি তখন লাইনের পাশ দিয়ে নেমে জঙ্গলের ভিতরে দৌড়তে দৌড়তে চোখের নিমেষে কোথায় হারিয়ে গেল। কত রাত হয়েছিল তখন, বুঝতে পারে নি আরতি।

সরল রেখার মতো বহুদূর বিস্তৃত রেল-লাইন। রাতের রেল-লাইন যে অমনভাবে কাঁপে ধারণা ছিল না ওর। নাকি বহুদূর দিয়ে ছুটে যাওয়া রেলগাড়ির চাকার স্পন্দন এখানেও ছুটে এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল লাইনটাকে! আর সেই সঙ্গে আরতিকেও!

আরতি নিঃসাড়ে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে ছিল এ লাইনের ওপর। হাত পা টেনে তোলার মতো শক্তি ছিল না ওর। তেমন কোন আগ্রহও ছিল না। এই দেহটাকে তো ওরা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এ কলঙ্ক নিয়ে দিনের আলোয় কোথায় ও মুখ দেখাবে। লাইনের ওপরই পড়ে থেকে অঝোরে বেশ কিছুক্ষণ কেঁদেছিল আরতি।

তারপর ধীরে ধীরে লাইন থেকে উঠে সরে এসেছিল একপাশে। বিশ্বাস করতে পারে নি, ওই চারমূর্তি ওকে ওইভাবে হাতছাড়া করে ফেলে রেখে চলে যাবে। হয়তো ওরা ভেবেছিল, আরতির নিঃসাড় দেহটা রেলের চাকায় দু'টুকরো হয়ে ছিটকে যাবে দু'পাশে। সকালে সেই বিকৃত মৃত্যু দেখার জন্য এই জলা-জঙ্গল ভেঙে শয়ে শয়ে লোক ছুটে আসবে এখানে। হয়তো ওরা নিশ্চিন্ত হয়েই পালিয়েছিল।

কিন্তু কি চেয়েছিল ওরা আরতির কাছে! এই তিন তিনটে দিন কেন ওরা আরতিকে অমনভাবে আটকে রাখল! কেনইবা ওকে পুরোপুরি মেরে না ফেলে অমনভাবে বাঁচার খানিকটা সুযোগ রেখে গেল! জগদীশের মৃত্যুর জন্য দুলালই যদি সত্যিকার দোষী, তাহলে দুলালকেই বা ওরা অমন ভাবে ছেড়ে দেবে কেন! কি জানি, কোন কিছুই ভাল করে বুঝতে পারে নি আরতি। বুঝবার জন্য সমস্ত আগ্রহ ওর নষ্টও হয়ে গিয়েছিল।

আরো কিছুক্ষণ স্থির থেকে ওই নিষ্ঠুর আকাশের নিচে বসে কাটিয়েছিল আরতি। তারপর অসহায় দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে

এসেছিল কাটাপুকুর উদ্বাস্তু কলোনির দিকে। এ ছাড়া তখন আর করবার মতো কিছুই ছিল না ওর।

তারপর বাড়ির উঠোনে কিভাবে যে ও এসে দাঁড়িয়েছিল এখন আর মনে করতে পারে না। সহসা লাফাতে লাফাতে বাড়ির কুকুরটা ছুটে আসতেই আবার কেমন সারা শরীরে এক অস্থিরতা এসে আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। সমস্ত দেহটা আবার ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠেছিল। আরতি শেষবারের মতো চেষ্টা করে দাওয়ায় উঠতে গেল কিন্তু তার আগেই সিঁড়ি আঁকড়ে বসে পড়তে হয়েছিল ওকে। আবার জ্ঞান হারিয়েছিল আরতি।

ওই চারমূর্তি নির্ঘাৎ খবর পেয়ে যাবে, আরতি মরে নি। রেল-লাইন থেকে উঠে আবার ফিরে গেছে দুলালের কাছে। খবর পাবেই, কিন্তু কি করার থাকতে পারে ওদের। ওরা তো ভালভাবেই জেনে গেছে দুলালকে, নইলে কি ওভাবে ওকে ছেড়ে দিত! আরতির সাধ্য ছিল না, দুলালকে ও বাঁচায়। দুলাল সম্পর্কে কেমন একটা বিরক্তি, ঘৃণা আঁকড়ে ধরছিল আরতিকে।

লোকটার এমন একটা পরিচয় কিছুই জানা ছিল না ওর। ছোট সংসার দেখেই হয়তো ওর বাবা মা এখানে ওকে কাছে বিয়ে দেওয়ায় এত আগ্রহ দেখিয়েছিল। আরতিও কখনো আপত্তি করে নি। কখনো বুঝতেই দেয় নি, ও চেয়েছিল আরো সচ্ছল সুন্দর কোন সংসার। শেষ পর্যন্ত এই ছোট সংসারেই নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল আরতি। কিন্তু যেদিন ওর শাশুড়ী ওকে সেই বন্ধকী সোনার হারটা দেখাল, সেদিন কেমন যেন চমকে উঠেছিল ও। বন্ধকী কারবার করার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। চিরকাল বন্ধকী কারবারীদের ওরা ঘৃণাই করে এসেছে। অথচ ভাল করে না জেনে ওর বাবা ওকে এ সংসারেই বিয়ে দিল।

আরতি মনের ক্ষোভে একদিন প্রশ্ন করেছিল দুলালকে, তোমরা সোনা গয়না বন্ধক রাখো?

চমকে উঠেছিল দুলাল, কে বলল ?

—এ কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। এ কথা চাপা দেওয়া যায় না।

দুলাল সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আগে প্রথম দিকে যখন আমাদের খুব আর্থিক টানাটানি ছিল তখন বাবা ওসব করতেন। না করে আমাদের উপায় ছিল না।

—এখন কর না ?

—এখন ? না তো। কে বলেছে তোমাকে ? মা ?

—যেই বলুক না কেন। আমরা ওসব ভাবতেই পারি না। লোকের অভাবের সুযোগ নেওয়ার কথা আমরা ভাবতেই পারি না।

দুলাল অপরাধ অস্বীকার করে নি, বরং আরতির সঙ্গে দুলালও একমত হয়েছিল, বিশ্বাস করো আরতি, বন্ধকী কারবার আমিও চাই না। চাইলে বাবা যা করতেন আমিও সে কাজই করতাম, ওতে অনেক পয়সা। অসহায় লোককে ঠকাতে জানলে পয়সার অভাব হয় না।

আরতি দুলালকে অবিশ্বাস করে নি। দুলালের মধ্যে এমন কিছু সারল্য দেখেছে আরতি, যাতে ওর আকর্ষণ বেড়েই গিয়েছিল। কিন্তু শনিবারের ঘটনা সব কিছু কেমন যেন ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। আরতি কিছুতেই ভাবতে পারে না, দুলাল স্পাই। পুলিসের কাছে গোপন খবর পাচার করাই ওর কাজ।

দুলাল যে পুলিসের স্পাই আগে কখনো একথা ভাবতেই পারে না আরতি। অথচ সত্যি কতক্ষণ গোপন থাকে। ওই শয়তানগুলো দুলালের কথা বার করার জন্যই হয়তো অমনভাবে আরতিকে আঁকড়ে ধরেছিল, এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না ওর।

সেই হাত উড়ে যাওয়া লোকটার কুৎসিত চোখদুটো এখনও ওর চোখের ওপর ভাসছে। কী বিশ্রী কথা বলার ঢং, কী সব অঙ্গভঙ্গি! এই, এই ছিনালী, তোমার হাজব্যাণ্ড শালা কি কি করে ? কোথায় কোথায় যায় ?

আরতি এসব ক্ষেত্রে যা যা করার তাই করেছিল, মুখে একটাও শব্দ করে নি। দুলাল সম্পর্কে এ রকম একটা প্রশ্ন তো আরতিরও রয়ে গেছে। কোথায় যায় দুলাল! কি করে ও! কি চায়!

—বলবে না? তবে রে?

আরতি চরম লাঞ্ছনাও সয়ে এল মুখ বুজে। এছাড়া ওর উপায়ও ছিল না তখন। সেই লম্বা ঝাঁকড়া চুলআলা লোকটা বার বার জানতে চাইছিল, হর্স পাওয়ার কে? কলোনিতে সে ঘন ঘন আসে কেন? আরতি বোধহয় সেই প্রথম হর্স পাওয়ার নামে কেউ যে থাকতে পারে তা জানল।

অথচ এ সব কথা ঘুণাক্ষরে দুলাল ওকে বলে নি। বলার প্রয়োজনই মনে করে নি।

ঘৃণায় কেমন গুটিয়ে এসেছিল আরতি। তবে কি সারাক্ষণ দুলাল ওর সঙ্গে অভিনয় করে গেছে! তবে কি দুলাল কেবল সেইটুকুই ওকে বলত, যাতে ওর স্বার্থ রয়ে গেছে! স্বার্থপর!

—কি হল, বলবে না?

আরতি ডুকরে উঠেছিল, আমি জানি না। কিছুই জানি না ওসব।

—জানো না, না? ঠিক আছে, কি করে কথা বার করতে হয় আমরাও জানি। আরতি সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ভুলতে পারবে না। অসম্ভব, কিছুতেই ভুলতে পারবে না আরতি। এর চেয়ে ওরা ওকে মেরে ফেলল না কেন! ওরা ওকে অনায়াসেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারত। দিল না কেন!

সারাটি দিন ওকে ওই বদ্ধ ঘরটার মধ্যেই আটকে রেখেছিল ওরা। সারাটি দিন কী ক্লান্তি! ঘরের একপাশে একটা কুঁজো গ্লাস। গোটা দুয়েক শুকনো পাঁউরুটি পিঁপড়ে ধরা। অসম্ভব ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে ছটফট করেছে, কিন্তু ওই রুটি ভুলেও ও ছুঁয়ে দেখে নি। কুঁজো থেকে আলগা করে জল খেয়েছে কয়েকবার। কিন্তু ওই জলে কি ঘুমের ওষুধ মেশান ছিল! ঘুমের ওষুধই। নইলে অত ঘুম-ঘুম কেন? অত ঝিমঝিম

আচ্ছন্ন ভাব কেন! ঢক ঢক করে জল খাওয়ার পর কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল আরতি। কবেকার জল কে জানে! তাছাড়া জলে বিষ মেশান আছে কিনা তাই বা কে জানে! ওকে বিষ খাইয়ে মারাও অসম্ভব নয়। পরে রহস্যটা পরিষ্কার করে দিয়েছিল বুবু নামে সেই লোকটাই। অদ্ভুতভাবে হেসে উঠেছিল, কি, কুঁজোর জল খেয়েছো তো! ভয় নেই, ও জলে ঘুমের ওষুধ ছাড়া আর কিছুই মেশান নেই। মরবে না। আমরা মেয়েমানুষকে মেরে হাত গন্ধ করি না।

আরতি উত্তর দেয় নি। ওদের কোন কথারই উত্তর দেওয়া যায় না।

বুবু পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট এগিয়ে ধরেছিল এ সময়। খেয়ে নাও। এটাও ঘুমের ওষুধ। ঘুমুলে শরীর ভাল থাকবে। খাও, খেয়ে নাও।

—আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে এভাবে আটকে রাখছেন?

—কথা বেরিয়েছে তাহলে! ঠিক আছে, আমরা এখনই ছেড়ে দেব। চাই কি কলোনিতে তোমাকে পৌঁছেও দিয়ে আসব কিন্তু আমরা যা জানতে চাই, তার জবাব দাও।

—আমি কিছুই জানি না।

—জানো না! জগদীশের সঙ্গে আলাপ ছিল না তোমার? জগদীশ তোমাদের বাড়ি যেত না?

আরতি মাথাটাকে এলিয়ে রেখেছিল একপাশে। জগদীশ মাঝে মাঝেই আসত। ওরকম তো আরো অনেকেই আসে, আসতে পারে। জগদীশ ওকে বৌদি বলে ডাকত, চা খেতে চাইত। দুটো-একটা হাসি-ঠাট্টাও করত জগদীশ, কিন্তু তার বেশি একটি কথাও জানে না আরতি।

লোকটা আবার দাঁত খিঁচিয়ে প্রশ্ন করল, জগদীশের সঙ্গে আলাপ ছিল না?

আরতি সংক্ষেপে উত্তর দিল, ছিল।

—জগদীশ যে পার্টি করত সে কথা তোমরা জানতে না?

—আমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই নি। জগদীশবাবু মাঝে মাঝে আসতেন, চা-টা খেতেন।

—আর তোমার হাজব্যাণ্ড কি করত তখন? ঐ শালা শুয়োরের বাচ্চা কি করত তখন?

প্রশ্নটা ঠিক বোধগম্য হয় নি আরতির। কি করত দুলাল! কই এমন কিছু তো মনে পড়ে না, জগদীশ এলে দুলাল কি করত ওর সঙ্গে!

—জগদীশকে নিয়ে দুলাল গোপনে গোপনে কোথায় যেত, জান না?

আরতি কিছুই জানে না। সত্যি সত্যি কি জগদীশকে নিয়ে গোপনে গোপনে কোথাও যেত দুলাল! কোথায় যেত! কোন সর্বনাশের পথে যেত ওরা! আরতি স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল, জানি না, কখনো দেখি নি।

—তার মানে জবাব দেবে না। ঠিক আছে আজ দেবে না, কাল দেবে। যতক্ষণ না জবাব পাচ্ছি, থাক এখানেই।

ঘুমের ওষুধটা ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল বুবু। যদি মনে কর, খেয়ে নিতে পার। না খেলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। আর যদি কোনভাবে চেঁচাবার চেষ্টা কর সে ফলভোগ কিন্তু তোমাকেই করতে হবে।

ওরা শেষ রাতের দিকে আরতিকে ওই ঘরেই তালাচাবি বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

বেরিয়ে গেলেও ওরা যে ওই ঘরটাকেই সারাক্ষণ নজরে রেখেছিল, আরতির তা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। মাঝে মঝেই ঘরের বাইরে ওদের গলার আওয়াজ পেয়েছে আরতি। অবশেষে সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে কেমন গুঁড়িয়ে আসতে শুরু করেছিল ওর। শয়তানগুলো কুঁজোর জলে হয়তো মুঠো মুঠো ঘুমের বড়ি মিশিয়ে রেখেছে। মুঠো মুঠো ঘুমের বড়ি খেলে তো মানুষ মরেও যায়। আরতির মনে হয়েছিল, এর চেয়ে ঘুমের মধ্যে মরে গেলেও যেন বেঁচে যায় ও। মেঝে থেকে ট্যাবলেটটা কুড়িয়ে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিল আরতি। তারপর সেটাও জিভের ওপর পেতে রেখে আবার জল খেয়েছিল আরতি। হে ভগবান, এই ভাবেই যেন আমি মরে যাই।

ঘরের নোংরা মেঝের উপরই পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছিল ও। সমস্ত ঘাড়ে গলায় পিঠে অসম্ভব ব্যথা। সত্যি সত্যি কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিল।

তারপর সে ঘুম যখন ওর ভাঙল, তখন দিন কি রাত বুঝতে পারে নি আরতি। সমস্ত শরীরটা ওর ভেঙেচুরে যেন তছনছ হয়ে গেছে। ওই তো শয়তানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরের ভিতরই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিসফিস করে কি যেন বলছে কি বলছে ওরা?

আরতি হাত-পা নাড়ার চেষ্টা করল, সমস্ত শরীরটা যেন আলগা হয়ে খসে পড়েছে মাটিতে। ওর জামা কাপড়ের এ অবস্থা কেন! মাথাটাকে এলাতে গিয়েই বুঝল, পশুগুলি অসহায় আরতির ওপর সুযোগ নিয়েছে।

উথলে কেঁদে উঠেছিল আরতি। চোখ বেয়ে অঝোরে জল নেমে এসেছিল ওর।

॥ নয় ॥

কবরখানার দিক থেকে আবার বোধহয় পাখিগুলো ছুটে এসেছে কলোনির দিকে। ঘুম ভেঙে গেল প্রীতিলতার। সারাটা রাত যে ভাল ঘুম হয়েছে এমন নয়। আধো ঘুম আধো জাগরণের ভিতর দিয়ে কেটেছে ওর। একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমোন যায় না। দুশ্চিন্তা দুলালকে নিয়ে। কি যে করে ও বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই। তার উপর ওই বউটা যে কোথায় কি করে এল, মাগো. ঘেন্নায় মরে যাই। দুলাল এর পরও ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কি ভাবে! যদি সাধ্য থাকত প্রীতিলতার ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে বউটাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়ে আসত। ছেলে তো আর জলে পড়ে নি, তু দিলে হাজারটা মেয়ে এখনি ছুটে আসবে।

সত্যি বড় অদ্ভুত লাগে প্রীতিলতার। ওকে কিছু না বলে ঘরের

বউ বেলেঘাটা চলে গেল। আবার কাউকে কিছু না বলেই অত রাতে ঐ চেহারা নিয়ে ফিরে এল। ওর বাপ মাও কি মরে গেছে ? ওরাই বা কি রকম, মেয়ে কেনই বা গেল, আর কেনই বা অমনভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে ফিরে এল, সে সব কি খোঁজ করারও প্রয়োজন মনে করে না ? এ কি রকম বিবেক ওদের !

প্রীতিলতা ঠিক করলেন, যাই ঘটে থাক, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে ওদের সঙ্গে। দুলাল যদি ঐ অসতী মেয়ের সঙ্গ না ছাড়ে যে দিকে দু' চোখ যায় বেরিয়ে যাবেন প্রীতিলতা। সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল বলে একটা কথা আছে। কিছুতেই এত বাড়াবাড়ি সহ্য করা যায় না। নষ্ট মেয়েটাকে বাড়ি থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত দরকার হলে জলস্পর্শও করবেন না আর।

রাগে ক্ষোভে বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে উনি ফুঁসলেন, তারপর উত্তেজনাতেই উঠে বসলেন।

ছেলেটার ওপরই বেশি করে ক্ষোভ জমছিল ওর।

এমন বুদ্ধিহীন সন্তান কি করে উনি পেটে ধরলেন ভাবতেই অবাক লাগে। অথচ ওদের সংসারে ওর ঠাকুরদা একবাক্যে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। কত বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন। কত সম্মান পেয়ে গেছেন উনি। দুলালের বাবাও বংশের ধারা বহন করে এসেছে। সংসারের জন্য কি না করেছে ও। নেহাত পাকিস্তান হল, দেশ ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হল ওদের, নইলে এ রকম কুকুর ছাগলের মতো বেঁচে থাকার কথা ভাবাই যায় না।

অথচ দুলাল যদি তার বাবার এক কণাও পেত। কিছুতেই তাহলে বউয়ের এই কীর্তিকলাপ সহ্য করত না। ছেলেটাকে নির্ঘাৎ ওষুধ করেছে ওরা। প্রীতিলতা ভাবতে ভাবতে কেমন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

যত কিছুই হোক, প্রীতিলতা যতক্ষণ আছেন, এই অনাচার উনি সইবেন না। সইতে পারেন না। প্রয়োজন হয় দুলুকে আবার বিয়ে

দেবেন উনি। তুলুর ভবিষ্যত ঐ নোংরা বউয়ের হাতে উনি ছেড়ে দিতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠেছিল ওঁর। একে গুমোট গরম, তায় ছেলের ঐ পাগলামী। জানালা বন্ধ করে এভাবে কোন মানুষ দিনরাত কাটাতে পারে! তবু যাও বা এ কদিন এই গরমেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তেন উনি, কিন্তু ওই বউটাকে দেখার পর রাতের ঘুমও ওঁর কোথায় যেন উবে গেছে। সারাটা রাত িছানায় কেবল ছটফট করেই কাটিয়েছেন উনি।

প্রীতিলতা উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। প্রাত্যহিক নিয়মে লক্ষ্মীর আসনের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটা প্রণাম সারলেন, তারপর দরজা খুললেন। আহ্, বাইরে কী সুন্দর হালকা বাতাস। চোখমুখ জুড়িয়ে গেল ওঁর।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে একবার তুলুর ঘরের দিকে তাকালেন। এখনো দরজা খোলে নি ওরা। তুলু কি আজও অফিসে যাবে না! চাকরি ছেড়ে দিয়ে আর কতকাল ওই রাক্ষুসীটাকে নিয়ে ও কাটাবে!

একবার ইচ্ছে হল, দরজার কড়া নেড়ে ওদের উঠিয়ে দেন, কিন্তু কি মনে করে আবার পিছিয়ে এলেন প্রীতিলতা। আবার নিজের ঘরেই ঢুকলেন, মশারি তুললেন, বিছানা গুটোলেন, ঘর ঝাঁট দেবার জন্য তৈরি হলেন। ওপাশের জানালাটা ইচ্ছে করেই আজ খুলে দিলেন। দিয়ে জানালার শিক ধরে কলোনির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জানালার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে নিমগাছটা। হাত বাড়িয়ে গাছের পাতায় একটু আদর করলেন। আঙুলগুলি শিরশির করে উঠল। কী আশ্চর্য, এই নিম গাছটাও যেন পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে। এই গাছকেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওদের ওপর আর কি করে বিশ্বাস রাখেন প্রীতিলতা।

নাহ্, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। ঘরে এভাবে পাপ পুষে রাখা অসম্ভব।

প্রীতিলতা উত্তেজিত হয়েই আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। দুলুর ঘরের দরজার দিকে তাকালেন, এই দুলু, উঠবি না ? মানুষের ঘেন্নালজ্জারও একটা সীমা থাকা দরকার। তোরা কি সব লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছিস !

প্রীতিলতা যেন তার রাগের ঝাল আরতির ওপরই মেটাতে চাইলেন।

কিন্তু কোনরকম সাড়া এল না ওদিক থেকে। ওরা কি মরণ ঘুম ঘুমুচ্ছে !

প্রীতিলতা আবার বিড়বিড় শুরু করলেন, বাপের জন্মেও আমি এমনটি দেখি নি। রাত না ফুরতেই শাশুড়ী উঠে ঝিয়ের কাজ করবে, আর ঘরের বউ নির্লজ্জের মতো পড়ে পড়ে ঘুমুবে। এই দুলাল, তোরা উঠবি ? না, আমি লোক ডাকব।

প্রীতিলতা এবারও একটা উত্তরের অপেক্ষা করে রইলেন। রাক্ষুসীটা যে এখনো ঘুমুচ্ছে, এ কথা উনি বিশ্বাসই করতে পারেন না। কই, এতদিন তো প্রীতিলতা ওঠার আগেই ও উঠে পুকুর ঘাটে বাসন নিয়ে গিয়ে বসেছে। আজও যে না জেগে এখনো ও ঘুমুচ্ছে তা হতেই পারে না।

ও কি ভেবেছে, এই বুড়িই ওদের তরিবৎ করে রান্না করে খাওয়াবে। আর ওরা স্বাধীন মতো যা ইচ্ছে তাই করে যাবে। অসম্ভব। আর নয়, আর হতে দেব না এসব। প্রীতিলতা ঠিক করলেন, রান্নাঘরে হাঁড়ি কড়াই থালা বাসন যা যেমন আছে আজ সব ঐ ভাবেই থাকবে। উনি কিছুতেই আজ রান্নাঘরে ঢুকবেন না। আস্কারা পেতে পেতে ওরা মাথায় উঠবে, তা আর হতে দেবেন না উনি। প্রীতিলতা জানেন, কি রোগের কি ওষুধ।

বিড়বিড় করতে করতে উঠোনে নেমে এলেন প্রীতিলতা। কবরখানার দিকটা এখনো স্পষ্ট নয়, কেমন রহস্যময় হয়ে রয়েছে। ঝাপসা, আবছা আবছা।

এই কবরখানার মুখোমুখি বাড়ি বলেই কি এমন সব অনাসৃষ্টি ঢুকল ওদের সংসারে! কথাটা প্রায়ই মনে আসে প্রীতিলতার। ঘরের দরজা খুলতেই এমন একটা নচ্ছার জায়গা চোখে পড়ে, এরই জন্য কি দিন-গুলো এমন খারাপ যায় ওদের! অথচ এছাড়া আর উপায়ই বা কী! তুলুর বাবা পুকুরের ধারে বলে এ জায়গাটা তো নিজেই বেছে নিয়েছিল। তখন ভুলেও একবার ঐ কবরখানাটার কথা মনে আসে নি ওদের!

মনে পড়ল, দেড়শ দু'শ উদ্বাস্তু পরিবার যখন এই বেওয়ারিশ জলা জমিটার সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হামলে পড়ল, সেই দিনগুলোর কথা। কি খাব, কিভাবে শোব তার ঠিক নেই, তুলুর বাবা তার শেষ পুঁজিটুকু সম্বল করে দড়ি, বাঁশ, দাপনার বেড়া কিনে এখানে জমি আঁকড়ে বসে পড়ল। কী দুর্ভোগই না গিয়েছিল ওদের সে সময়। তখন এই যে জমিটা পাওয়া গেছে এটাই স্বর্গ, কবরখানার কথা ভাবার সময় কোথায় তখন!

সব চেয়ে ভাল জমি, সবচে নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট জমি মনে করে এ জায়গাটাই তুলুর বাবা বেছে নিয়েছিল। তখন একবারের জন্যও মনে আসে নি ওই কবরখানাটাই একদিন ওদের কাল হবে। ওই কবর-খানার বাতাস প্রতি মুহূর্তে ওদের এই বাড়ির ওপর আছড়ে পড়বে। যদি ঘুণাক্ষরেও এসব কথা তখন মাথায় আসত, প্রীতিলতা কিছুতেই এ জমিতে বাড়ি তুলতে দিতেন না তুলুর বাবাকে। এর চেয়ে দিনের পর দিন শিয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকাও ভাল ছিল।

আসলে ভাগ্যটাই প্রীতিলতার খারাপ। দেশ ভাগ হল, এই কলকাতায় এসে যাওবা ওরা একটা আশ্রয় পেল তা এইরকম। এর ওপর আবার ছেলের বিয়ে দিয়ে আজ উনি হাতে হাতে তার ফল পাচ্ছেন। সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বিশ্বাস না করে উপায় আছে!

প্রীতিলতা কবরখানার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই দেখলেন, রাক্ষুসীটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। তুলুর ঘরের দরজাটা হাঁ হয়ে খুলে আছে।

প্রীতিলতা ঘুরে দাঁড়ালেন, ওঠার কি দরকার ছিল ? বাড়িতে দশটা ঝি চাকর আছে, শুয়ে থাকলেই তো পারতে ?

আরতি একটু বাঁকাচোখে তাকাল. কিন্তু গ্রাহ্য করল না।

—কথা কানে গেল না বোধহয় ? তা যাবে কেন, দুলুকে ওষুধ-টষুধ করে বশ করে রেখেছ, এখন ধরাকে সরা জ্ঞান তো করবেই।

এ যেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা। আরতি এবারও জবাব দেবে না ভেবেছিল, কিন্তু হঠাৎ কি হল, আরতি বলল, এই সকালে কি ঝগড়া না করলেই নয় ?

—ঝগড়া, আমি ঝগড়া করি ! ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এলেন রে ! দেখ বউমা, তোমার চোদ্দগুষ্টির ভাগ্য ভাল এ সংসারে এসেছ। অন্য কারো কাছে হলে তোমাকে ঝাঁটা-পেটা করে বাড়ির বাইরে বার করে দিত।

শরীরের ধকল তখনো কাটে নি আরতির। তাছাড়া তখনো ওর স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে বিষ দংশন। সারাটা রাত নির্ঘুম উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। ঘুমুতে পারে নি। সমস্ত ঘুম ওর লুঠেরারা লুঠ করে নিয়ে গেছে। রাত ফুরুতে না ফুরুতেই যে ওর শাশুড়ী চিৎকার শুরু করে দেবে ভাবতে পারে নি আরতি। হঠাৎ এ রকম একটা উক্তি, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি বললেন ?

—কানে কি কম শোন আজকাল ? এ সংসারে থাকতে হলে অত মেজাজ রাখা চলবে না।

—মেজাজ আমি করছি, না আপনি করছেন ?

প্রীতিলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরে আমার পেটের শত্তুর, শোন, শুনে যা। কোথথেকে সংসার ভাঙার জন্য আমি ডাইনি এনেছি, দেখে যা। আমার কি হবে গো—

প্রীতিলতা বেশ গলা তুলেই চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। আরতি আর অপেক্ষা করল না, দুপ-দাপ করে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

ওদিকে ততক্ষণে দুলালও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, কি হল ? কি হয়েছে ? অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

প্রীতিলতা হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, কি হয়েছে ! চোখ নেই ? দেখতে পাস না ?

দুলাল আরতির দিকে তাকাল, আরতি পুকুর ঘাটে মুখ ধুতে বসেছে। কি হয়েছে বলবে তো ?

—তোর বউ বলে কি না, আমি মেজাজ দেখাচ্ছি। আমি তোদের খাই না পরি ?

—তুমি থামবে মা ! এই সকালবেলা, এখনই শুরু করে দিলে !

—হ্যাঁ, আমিই তো শুরু করি। হে ভগবান আমার কেন মরণ হয় না গো।

তারপর প্রীতিলতা একটু থেমে গলায় বিষ ঢেলে আবার শুরু করলেন, সেই কাক ভোরে উঠে তোদের গেলাবার জন্য আমি বাসন মাজব, উনোন ধরাব, কুটনো বাটনা সবই আমাকে করতে হবে, কেন, আমাকে কি ঝি রেখেছিস বাড়িতে ?

দুলাল তবু নরম গলায় বলল, মা, তুমি একটু থামবে ?

—কেন, কেন থামব ! তোর বউকে থামাতে পারিস না ! তোর বউ যখন কথা শোনাতে আসে, তখন থামাতে পারিস না !

—ঠিক আছে, ওকে আমি বারণ করে দেব। তুমি একবার এদিকে একটু আসবে ?

দুলাল চারপাশে তাকাল। এখনো কলোনিটা পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু মা যেভাবে গলা চড়াতে শুরু করেছে, তাতে কেউ না কেউ হয়তো এখনি এসে ওদের ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করবে। তা করুক, তাতেও কোন আপত্তি নেই, কিন্তু দুলালের ভয়, আরতি সম্পর্কে কখন কি বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়বে মায়ের মুখ দিয়ে। মায়ের মুখ এমনিতেই বড় আলগা।

দুলাল আবার ডাকল, মা, একটু শোন না। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—কি কথা ? প্রীতিলতা সন্দেহের চোখে তাকালেন।

—এদিকে এসো। এই ঘরে। আমি চেঁচিয়ে বলতে পারব না।

প্রীতিলতা গুটি গুটি পায় এগিয়ে এলেন, কি হয়েছে ? বল ?

দুলাল খাটের ওপর বসল, আরতির ওপর তুমি মিছিমিছি রাগ করছ মা। বিশ্বাস করো, ওর কোন দোষ নেই।

প্রীতিলতা তেমনি থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি বলতে চাস বল ? আমার সময় নেই।

—আরতি ভোরবেলা ওভাবে এসে হাজির হয়েছিল বলেই তুমি রাগ করছ।

—বউয়ের সাফাই গাইতে এসেছিস ?

দুলাল তবু চটল না। যেভাবেই হোক মাকে এখন ঠাণ্ডা না রেখে ওর উপায় নেই। বলল, সাফাই গাইব কেন, আরতি যদি অন্যায় করে, নিশ্চয়ই তুমি বকবে। আরতি তোমার মেয়ের মতো।

প্রীতিলতা ছেলের চোখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলেন না, কি বলতে চায় ও। তাকিয়েই থাকলেন।

—আসলে সে দিন ও-ভাবে ওর এখানে আসা ছাড়া উপায়ও ছিল না। তুমি যদি সব জানতে তাহলে বুঝতে পারতে।

—কি হয়েছিল ওর ? সন্দেহের চোখে প্রশ্ন করলেন প্রীতিলতা।

দুলাল একবার ঢোক গিলল, আসলে ও বেলেঘাটা থেকে কেন যে অত রাতে ঝগড়া করে বেরুতে গেল। বেলেঘাটাতে সেদিন ওকে নিয়ে গিয়েই ভুল করেছিলাম। আমারই ভুল। আসলে বুঝলে মা, যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে, সেটা আমিই করেছি। আসলে আমিই।

প্রীতিলতা বুঝলেন, বউয়ের দোষ ঢাকতে এসেছে। কী যে পেয়েছে ও ঐ মুখপুড়ী বউটার মধ্যে ওই জানে। বিরক্তিতে বিড়বিড় করে উঠলেন, ও মেয়ে বাপ মায়ের মুখে কালি দিয়েছে, এখন এখানে এসেছে মরতে। দেখ দুলাল, তোকে স্পষ্ট বলে রাখছি, আমার চোখের সামনে এ সব অনাসৃষ্টি ঘটবে এ আমি কিছুতেই সইব না। এখনো

সময় আছে বার করে দে। ও বউকে ঝাঁটা-পেটা করে বার করে দে।

—আহ্, আস্তে! তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না?

—আমাকে না বুঝিয়ে তুই নিজে বোঝ গে যা, আমার বুঝতে আর বাকি নেই।

—তবু সেই এক কথা। দুলাল একটা বানানো গল্প ফেঁদে ফেলেছে ততক্ষণে। আরতির বোন ভারতীর কথা টেনে আনল, ভারতীকে তো তুমি চেন! আসলে বেলেঘাটায় ওরা দু'বোনে সেদিন খুব ঝগড়া করেছে। আরতি তারপর রাগে বেলেঘাটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। অবশ্য অত রাতে ওভাবে বেরুনটা ওর উচিত হয় নি। আমি সে জন্য ওকে খুব গালাগালিও করেছি।

প্রীতিলতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, কচি খুকি কি না! রাত দুপুরে একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল! ওসব গপ্টপ্প তুই কাকে শোনাতে এলি দুলু?

দুলাল বলল, আমি তো বলেছি, ও-ভাবে ওর বেরুনটা উচিত হয় নি। আরতি বলছে, ঝগড়া করে ও মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। তারপর কি হল শোন না।

প্রীতিলতা ভ্রু কুঁচকে থাকলেন।

দুলাল বলল, অত রাতে যে গাড়িঘোড়া কিছুই নেই ও টের পেল বড় রাস্তায় এসে। তখনই ওর আবার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কপালের লেখা, রাস্তায় একদল মাতালের হাতে পড়ল। তখন আর কি করে, ছুটতে ছুটতে প্রাণের ভয়ে—

প্রীতিলতা দুলালকে বাধা দিলেন না। গম্ভীর হয়ে শুনলেন। তারপর ধূর্ত চোখে জিজ্ঞেস করলেন, আর কি কি বলবি?

—তোমার পায়ে পড়ি মা, অমন করো না ওর সঙ্গে। না হয় আমিই ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। ও এমনিতেই খুব লজ্জায় আছে, ওকে আর—

প্রীতিলতা বললেন, ওসব কথা আমায় শোনাস না। লজ্জা-সরম

ওর কিছুই নেই। আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সজোরে দরজা বন্ধের শব্দ পেতেই থেমে গেলেন।

দুলাল ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, আরতি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আবার কি হল, কে জানে! একদিকে মা, আর একদিকে আরতি, দুলাল এখন কাকে সামলায়। অথচ আজ একবার ওর অফিসে না গেলেই নয়। বেশ কয়েকদিন না জানিয়েই কামাই হয়ে গেছে। বানিয়ে বানিয়ে কিছু অজুহাত দেখাতে হবে। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সরকারবাবু যা খিচ মেজাজী লোক, চাকরিটা খেয়ে দিতে পারে।

অফিসে যেতে হলে ওকে সকাল নটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু মা বা আরতি কারোরই এখন পর্যন্ত রান্নাঘরের দিকে নজর নেই। মা বা আরতি কাউকেই বলা যাবে না, আজ ও অফিস যেতে চায়, সকাল ন'টার মধ্যেই ওকে খেয়ে বেরুতে হবে।

আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, মা আর আরতি দুজনকে বাড়িতে রেখে গেলে চুলোচুলি না বেধে যায়। আরতির যা মনের অবস্থা তাতে ও সাংঘাতিক কিছু করেও বসতে পারে। কেমন হতাশভাবে ও বন্ধ দরজার দিকে তাকাল।

পেছনে ততক্ষণে প্রীতিলতাও বেরিয়ে এসেছেন। মহারানী কি আবার শুতে গেল?

দুলাল উত্তর করল না। দরজার কাছে এগিয়ে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে দরজার কড়া ধরে একটু নাড়ল, আরতি! এই আরতি!

—যা, তুইও যা, বউয়ের চরণ সেবা কর গে যা। পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলেন প্রীতিলতা।

—আরতি! কী মুশকিল! এই আরতি! আবার ডাকল দুলাল।

ভেতর থেকে কোন উত্তরই এল না। দুলাল এবার একটু জোরে জোরে কড়া নাড়ল, আমি আজ অফিসে যাব আরতি। আজ না গেলে

আমার চাকরিই খতম হয়ে যাবে। শুনছ? আমি একটু সকাল সকাল বেরুতে চাই।

আরতি কি সত্যি সত্যি শুয়ে পড়ল! শুয়ে যদি পড়েও দরজাটা বন্ধ করল কেন! সারাদিন কি এভাবে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকবে নাকি!

—কি হল? শুনতে পাচ্ছ না, এই—

হঠাৎ থমকে গেল। দরজা খোলার শব্দ স্থির হয়ে দাঁড়াল দুলাল। দরজা খুলেই আরতি আবার সরে গেল ভিতরে।

—কি হয়েছে? ওকি? কি গুছোচ্চ? দুলাল দেখল, আরতি নিঃশব্দে তার ছোট্ট স্যুটকেসটায় শাড়ি ভরছে। কেমন কৌতুকে দাঁড়িয়ে রইল দুলাল, ও সব কি হচ্ছে?

আরতি স্যুটকেস গুছোতে গুছোতেই জবাব দিল, কি করছি, তা তো দেখতে পাচ্ছ? চোখ নেই?

দুলাল বুঝতে পারছে না, স্যুটকেস গুছোনোর অর্থ কি চলে যাওয়া, না কি অন্য কিছু? কিন্তু কোথায় যাবে আরতি!

—এই আরতি, কি ছেলেমানুষি শুরু করলে। মা কি বলছে না বলছে, ওসব কথায় কান দিচ্ছ কেন? এই! স্যুটকেস ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল দুলাল।

—বিরক্ত করো না বলছি। আমার শরীর খুব খারাপ। আরতি আবার স্যুটকেসটা টেনে নিল।

—শরীর ভালো নয় তো ঘুমোও না। চান-টান করে কিছু খেয়ে এসে ঘুমিয়ে নাও না। আর মাথা থেকে ওসব তাড়াও দেখি। যত মনে পড়বে ততই খারাপ লাগবে। আমি তো প্রাণপণে ও-সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি। বেঁচে থাকতে হলে কত কিছু সহ্য করতে হয়।

যেন এক গাদা উপদেশ দিল দুলাল।

আরতি বলল, তুমি যা পার, সবাই যে তা পারবে এমন কথা নয়। আমি এখানে থাকব না।

দুলাল কিছুক্ষণ পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে থাকল। বুঝতে পারল না, এই মুহূর্তে ওর কি করা দরকার।

—আমার কিন্তু মনে হয় আরতি তুমি ভুল করছ। কয়েকটা দিন কেটে গেলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। মাও আবার হাসিমুখে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

—তুমি আর তোমার মা-ই হাসিমুখে থাক। আমার এখানে থাকা হবে না। আমি বেলেঘাটা যাব ঠিক করেছি।

—বেলেঘাটা। সে তুমি যেতে চাও, আমিই না হয় তোমাকে দু'চার দিন পরে পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু আজই যদি যাও সেটা খুব খারাপ হবে।

আরতি রুখে দাঁড়াল, কি খারাপ হবে? কার খারাপ হবে—আমার না তোমাদের?

—না মানে, তুমি বুঝতে পারছ না। পাড়ার লোক এমনিতেই কী ভাবছে কে জানে! এর মধ্যে তুমি যদি এখনি আবার বেলেঘাটা যেতে চাও, সত্যি সত্যি খারাপ হবে।

আরতি সুটকেসের তালা বন্ধ করল, আমাকে যেতেই হবে। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে।

—আমরা তাড়াব! কী বলছো আরতি! আমি কক্ষনো তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি যে ও কথা বলছ? তোমার জন্যই যে আমার জীবন বেঁচেছে একথা আমি কোন দিন ভুলতে পারব!

—আজ তাড়াবে না, দু-এক মাস গেলেই আমার মতো অসতী মেয়েকে তোমরা তাড়িয়ে দেবে।

—তুমি অসতী! কী বলছ আরতি! পৃথিবীর কেউ কিছু জানুক আর নাই জানুক আমি তো তোমাকে জানি।

—জানো? না, কিছুই জানো না। জানা সম্ভব নয়। আমার শরীর ভালো নয়।

—শরীর তোমার ভালো না থাকারই কথা। এ কদিন তোমার ওপর যা ধকল গেছে, সে কি আর আমি জানি না।

এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে সাহস পাচ্ছিল না তুলাল। ভীষণ-ভাবে গলা শুকিয়ে আসছিল ওর। শুয়োরের বাচ্চাগুলো এ কদিন ওকে নিয়ে কি করেছে কে জানে। জানতে আর সাহস নেই তুলালের। নারীর সম্মান যে ওরা রাখবে না, সে তো ধরেই নেওয়া যায়। তবু যে ওরা শেষপর্যন্ত প্রাণে মারে নি আরতিকে এই তো ঢের।

—যদি বলি, আমার শরীর খারাপ হয়েছে অন্য কারণে?

—কি কারণে?

—শুনতে তোমার ভালো লাগবে না। তারচে বরং আমি বেলে-ঘাটা চলে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

—কি কারণে বল না? তুমি মাইরি এমন সব হেঁয়ালি করছ, কি বলব!

—হ্যাঁ, এসব কথা হেঁয়ালির মতোই শোনাবে। যাক গে, শুনতে চাইছো যখন, তখন আর লুকোব না। ওরা আমার পুরোপুরি সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ওরা—

কথাটা যেন বর্শার ফলার মতো তুলালের ব্রহ্মতালুতে এসে ফেটে পড়ল। আর সেই আঘাতে ঝরঝর করে ফিনকি দিয়ে রক্তস্রোত নেমে এল ওর চোখ মুখ গলা বেয়ে। রক্তের উষ্ণ স্পর্শে ও আর্তনাদ করে উঠল, কি করেছে ওরা?

—তিন চারটে রাক্ষুসে পুরুষ মিলে কি করতে পারে, বোঝ না? বলে দিতে হবে?

তুলালের চোখ-কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। পা টলে উঠল ওর। দেহটাকে একটু ঝুঁকিয়ে খাটের পাশে এনে নিজেকে ও সামাল দিল।

আরতিও ততক্ষণে একপাশে সরে এসেছে, এখন ঘেন্না হচ্ছে না আমাকে?

—যাহ্, তুমি মাইরি এমন করে ভয় দেখাতে পার!

দুলাল হাসি ঠাট্টা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল প্রসঙ্গটাকে, কিন্তু গলা বুজে এল আবার। বুকের ভেতর দপ-দপ করে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে বুক ফেটে।

সাপের মতো চোখদুটো জ্বলে উঠল আরতির, মাস দুয়েক গেলেই আমি তোমাদের জানাতে পারব ওরা আমার দেহের ভেতরেও কোন স্মৃতি রেখে গেছে কিনা।

এতটা হতে পারে আশা করে নি দুলাল। এ অবস্থায় আরতিকে যে ও বেলেঘাটায় যেতে বারণ করবে, সে শক্তিও ও হারিয়ে ফেলল। তবু একবার পাশ ফিরে তাকাবার চেষ্টা করল, হ্যাঁ, ওই তো আরতি দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ, আরতিই তো! কিন্তু এত ঝাপসা মনে হচ্ছে কেন! এত অপরিচিত মনে হচ্ছে কেন! আরতি এত দূরের মানুষ হয়ে গেল কিভাবে! ওর দিকে তাকাতেও এত ভয় কেন দুলালের!

অথচ বিয়ের পর থেকে প্রতিটি দিনই তো মনে হয়েছে আরতির জন্যই ওর বেঁচে থাকা। আরতির যত সুখদুখ সব তো ওরই। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন হয়ে গেল কিভাবে!

আরতি কি সত্যি সত্যি কাপড়-জামা পালটে নিচ্ছে! তবে কি সত্যি সত্যি ও চলে যাবে! ওকে কি কোনভাবেই আর আটকানো যায় না! দুলাল আবার কাতর গলায় ডুকরে উঠল, তুমি যেও না আরতি। তোমার পায়ে পড়ি—

আরতি নির্বিকার।

—বেলেঘাটায় গেলে সবাই যে জেনে যাবে আরতি।

—আর এখানে থাকলে বুঝি সব তুমি ঢেকে রাখতে পারবে? এতকাল যেভাবে আমাকে আগলে রেখেছ, সেভাবে বুঝি আগলে রাখতে পারবে?

—আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করব আরতি।

হঠাৎ আবার উত্তেজিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল আরতি, আর এ কদিন কোথায় ছিল তোমার সেই রক্ত? কাপুরুষ!

—তোমার যা ইচ্ছে তাই বল, আমি বাধা দেব না। আমাকে মেরে ফেল, কেটে ফেল, আমি সব সহ্য করে যাব আরতি, কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমাকে আবার ফিরে পেতে চেয়েছিলাম বলেই ঝুঁকি নিতে চাই নি।

—ঝুঁকি! ঠোঁট বাঁকা করে তাকাল আরতি, কি ঝুঁকি?

—বারে, ঝুঁকি নয়! আমি হয়তো সেই রাতেই পুলিসের গাড়ি নিয়ে ওখানে হাজির হতে পারতাম, কিন্তু আমি জানি, তাতে লাভ হত না। পুলিসের গন্ধ পেলেই ওরা তোমাকে শেষ করে ফেলত।

আরতি তাকিয়ে থাকল।

—ওরা আমাকে পুলিসের লোক বলে ভেবেছে, এরপর পুলিস নিয়ে গেলে, ওরা প্রথমেই তোমাকে চিরকালের মতো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করত!

—তা হলে তো তোমাদেরই মঙ্গল হত, তোমরা বেঁচে যেতে।

—যাহ্, তুমি কিভাবে যে কথা বলো আরতি! দোহাই তোমার, তুমি যেও না।

আরতি আবার সরে গেল। বলেছি তো, আর যেখানেই থাকি, এখানে আমার থাকা হবে না। আমার মতো নোংরা মেয়ের এখানে থাকা উচিতও নয়।

—আবার সেই এক কথা! ঠিক আছে, তুমি যদি চাও, এখনই আমি থানায় যাচ্ছি। পুলিসকে তো তুমি জান না, দু'দিন চেষ্টা করলেই পুলিস ওদের ঠিক খুঁজে বার করে আনবে।

আরতি কিছু শুনল বলে মনে হল না। হালকা করে কপালের পাশে একটু চিরুনি বুলিয়ে নিল, তুমি তামাকে একটু এগিয়ে দেবে? এই বড় রাস্তা অবধি গেলেই হবে। তা না হলে কলোনির সবাই আমাকে একা একাই যেতে দেখবে, তাতে তোমাদেরই অসুবিধা হবে।

দুলাল উঠে দাঁড়াল, আমি যে আজ থেকে আবার অফিসে যাব বলে ঠিক করেছিলাম আরতি। এ সব ঝামেলায় বেশ ক'দিন তো কামাই হল।

—ঠিক আছে, তা হলে যেও না। আরতি স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিল।

দুলালের সমস্ত জীবনীশক্তিই যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এভাবে একা একা স্যুটকেস হাতে আরতির বেরিয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না, তবু নড়তে পারল না দুলাল। আরতির ঝাপসা দেহটা কেমনভাবে যেন দরজা পেরিয়ে চোখের বাইরে মিলিয়ে গেল। আর ঠিক এই সময়ই সম্বিৎ ফিরে পেল ও। মন্টি আর বুলবুলদের বাড়ির ওপর দিয়েই তো আরতিকে যেতে হবে। কী সাংঘাতিক! দুলাল প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে আরতি বাড়ির উঠোনটুকু পেরিয়ে মিলিয়ে গেছে।

দুলাল শিঠিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সমস্ত হাত পা ভেঙে আবার এক প্রচণ্ড অবসাদ নেমে এল ওর দেহে। পায়ের নিচে মাটি যেন কাঁপছে বুঝতে পারল দুলাল।

॥ দশ ॥

দুলালের অফিস যাওয়া হল না। কি আর হবে চাকরি করে। কার জন্য অফিসে যাবে ও। আরতি কি সত্যি সত্যি মা হয়ে যাবে! ওই তিনটে রাতে শুয়োরের বাচ্চাগুলো কি আরতির এমন সর্বনাশ করে দিয়েছে! অসম্ভব, হতেই পারে না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না দুলাল।

তাহলে আরতি ও-সব বলল কেন! মিছিমিছি ভয় পাচ্ছে আরতি! নাকি মজা দেখাবার জন্য ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করছে ওদের। প্রতিশোধ নিতে চাইছে কি আরতি! কি জানি, কেমন যেন শূন্যতা এসে আঁকড়ে ধরে ওকে।

ঠিক আছে, আজই হর্স পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করব। শয়তানদের

ছেড়ে দিয়ে সত্যি সত্যি সেদিন ভুল করেছে দুলাল। সেই রাতেই ওর উচিত ছিল পুলিস নিয়ে শয়তানগুলোর ওপর ঝাঁ পয়ে পড়া। কী কুক্ষণেই যে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল দুলাল।

উত্তেজনায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল ও। ভীষণ দুর্বল লাগছে। সমস্ত কিছুই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চারপাশে একবার ফাঁকা চোখে তাকাল দুলাল, সামনেই পুকুর। পুকুরের দিকে প্রতিদিনের মতো আজও দুটো একটা ধবধবে বক দেখতে পেল ও। পুকুরে বেশির ভাগ জায়গাতেই কচুরিপানা। কোথাও কোন ব্যতিক্রম নেই, ওপারে সেই করবখানা প্রতিদিন যেমন দেখা যায় আজও ঠিক তেমনি। অথচ আজ সমস্ত পৃথিবীটাই ওলটপালট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

দুলাল দেখল, কলোনির দিকেও কোনরকম চাঞ্চল্য নেই, অথচ ও রাস্তা দিয়েই তো আরতি হেঁটে গেছে। ওকে ও-ভাবে যেতে দেখে কেউ কি ডেকে জিজ্ঞেস করে নি, ও বউমা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছ গো ? দুলু কোথায় ? কিংবা আরতিবৌদি, তুমি একা, কী ব্যাপার !

আরতি তখন কি উত্তর দিয়েছে ! কি উত্তর দিতে পারে আরতি ! আরতি কী সেই মস্তানগুলোর ঘটনা সব বলে দিয়েছে। সমস্ত পৃথিবী কী ওদের ওই নোংরা রাত্রিগুলোর কথা জেনে গেল। নাহ্, অসম্ভব। আরতি আর যাই হোক, ও-সব কথা মুখে আনতে পারবে না। আরতি আর যাই করুক, বুবুদের কথা কাউকে বলবে না।

দুলালের এ সময় মনে হল, ও আবার একটা ভুল করেছে। ওরই উচিত ছিল আরতিকে বেলেঘাটায় পৌঁছে দিয়ে আসা। তাহলে ব্যাপারটাতে কানঘুষার কোন সুযোগ থাকত না। কয়েকটা দিন ওখানে থাকলে হয়তো আরতি সহজ হয়ে উঠতে পারত। ওর মনের উত্তেজনাটা হয়তো কেটে যেতে পারত। তখন অনায়াসে আবার ওকে নিয়ে আসা যেত। আর ততদিনে মাকেও দুলাল ম্যানেজ করে ফেলতে পারত।

দুলাল কেবল ভুলই করে চলেছে। নিজের ওপরই ভীষণ আক্ষেপ

জমতে শুরু করে ওর। ছটফট করে ফাঁকা উঠোনে নেমে এল ও। চারপাশে তাকাল। না, মাকে কোথাও দেখা গেল না। মা পুকুর ঘাটে গেলে এখান থেকেই দেখা যেত। তুলাল রান্নাঘরের দিকে এগোল, না, ওখানেও নেই।

আরতি যে স্যুটকেস হাতে চলে গেল মা কি তা দেখেছে। মা কি ওকে ফিরিয়ে আনবার জন্য পিছু পিছু গেল? অসম্ভব! আরতি চলে গেলে মা বরং খুশীই হবে।

তুলাল মায়ের ঘরের দিকে তাকাল। দরজাটা হাট করে খোলা। এগিয়ে এল ঘরের দিকে। হ্যাঁ, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে মা।

তুলাল অপরাধীর মতো মায়ের দিকে তাকাল।

প্রীতিলতাও ঘর ঝাড় দেওয়া বন্ধ রেখে তুলালের দিকে তাকালেন, মহারানীকে যেতে দেখলাম মনে হল। কোথায় গেল?

তুলাল দরজায় তু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়াল, অত খিচখিচ করলে কেউ এখানে থাকতে পারে না। আমিও একদিন চলে যাবো।

প্রীতিলতা নির্বিকার। আবার জিজ্ঞেস করলেন, স্যুটকেস নিয়ে বেরুতে দেখলাম।

—হ্যাঁ, স্যুটকেসে কাপড়-চোপর ভরে নিয়েই চলে গেছে। আর তোমাদের মুখ দর্শন করবে না।

—বাঁচা গেছে। অমন নোংরা মেয়ে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় হয়, ততই সংসারের মঙ্গল।

—নোংরা! কি করেছে তোমার? তোমার কোন পাকাধানে মই দিয়েছে? তুমি ওকে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পার নি, আমি লক্ষ্য করেছি।

—হ্যাঁ, তাই তো, আমার আগের জন্মের সতীন কিনা।

নেহাত মা বলেই তুলাল এগিয়ে গিয়ে দড়াম করে একটা লাথি কষিয়ে দিতো পারল না। অন্য কেউ হলে কিছুতেই সহ্য করত না ও। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা থাকে।

—সে যাক, তুই কি অফিসে যাবি ?

দুলালের উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না। সরে এল দরজা ছেড়ে।

প্রীতিলতা বললেন, যদি অফিসে যাস তো বল, তাড়াতাড়ি দুটো ভাত ফুটিয়ে দেই। একগাদা কাপড় জমে আছে, কাচাকাচি করতে হবে।

—অফিসে যাই বা না যাই, তোমাকে ভাবতে হবে না। দুলালের গলা ভারি হয়ে এল।

প্রীতিলতা উঠে দাঁড়ালেন, তা তো বলবেই। এখন ডানা গজিয়েছে। এখন আর আমি কে !

—তুমি ওই একটা কথাই শিখে রেখেছ মা। তোমার ওই মুখের কাছে কে পারবে।

বিরক্তিতে দুলাল নিজের ঘরে চলে এল। নিজের দেহটাকে ছুঁড়ে দিল বিছানায়, তারপর মুখ গুঁজল একটা বালিশে।

কয়েক মুহূর্ত বোধহয় কেটেছিল, দুলাল টের পেল, মাও ঘরে এসে ঢুকেছে। মাথা তুলল না দুলাল। সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন এক অবসাদ, কেমন এক বিরক্তি আর হতাশা।

—বউমা কি বেলেঘাটাতেই গেল, না অন্য কোথাও ?

—অন্য কোথাও মানে ! দুলাল তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়, অন্য কোথাও বলতে কি বলতে চাইছ ? মাথায় যেন রক্ত চলকে উঠল ওর।

—বাপ রে, মারবি নাকি ! জিজ্ঞেস করাও দোষ ?

দুলাল বলল, যেখানেই যাক তোমার কি ? তোমার এখানে আর কোনদিনও আসবে না।

প্রীতিলতা একটু থমকে রইলেন। আসুক না আসুক, সে তো পরের কথা, কিন্তু কোথায় গেল, সেটা বলবি তো ?

দুলাল জানে, মায়ের সঙ্গে ও পেরে উঠবে না। বলল, হ্যাঁ, বেলে-ঘাটাতেই গেছে। এবার ওদিকে যাও দেখি, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

—তাহলে আজও তুই অফিসে যাবি না বলছিস ?

দুলাল বলল, না। আর কোনদিন যাব না। তুমি যাও।

প্রীতিলতা গুম হয়ে শুনলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও রইলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছিস ?

—জানি না।

—জানিস না। আর কত ছেলেমানুষি করবি দুলু ? বয়স কমছে না বাড়ছে ?

—আমার যা ইচ্ছে তাই করব। আমাকে বিরক্ত করতে এসো না বলছি। ভালো হবে না।

প্রীতিলতা ছেলের অঙ্গভঙ্গি দেখে কিছুটা বিস্মিতই হলেন। ডাইনীটা সত্যি সত্যি ওর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। কী কুক্ষণেই যে ও-রকম একটা বউ ঘরে এনেছিলাম। সংসারটা ডুবিয়ে দিয়ে গেল মুখপুড়ী।

—ঠিক আছে, না যাবি না যাবি। আমার আর কি ! আমার একটা পেট, ভিক্ষে করে খেলেও চলে যাবে আমার। প্রীতিলতা গজগজ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুলাল আবার বালিশে মুখ গুঁজল। ভীষণ কান্না পাচ্ছে ওর। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বালিশটাকে হঠাৎ মাথার কাছ থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল দুলাল। ঘরের এক কোণায় গিয়ে ওটা আছড়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই আবার নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল ও। মেয়েদের মতো এভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কান্না ওর শোভা পায় না। উঠে গিয়ে আবার বালিশটাকে ও তুলে নিল।

আরতি কি এতক্ষণে বেলেঘাটা পৌঁছে গেছে ! এখন অফিসের সময়, ট্রামেবাসে অসম্ভব ভিড় ; এই ভিড়ের মধ্যে একটা স্যুটকেস হাতে ঠিক মতো যেতে পারল কি আরতি ! এভাবে ওকে একা একা ছেড়ে দেওয়া কোনমতেই উচিত হয় নি দুলালের। অথচ এখন করণীয়ও কিছু নেই।

দুলাল যদি এখনিই বেলেঘাটা গিয়ে হাজির হয়, ওরা কি ভাববে ! আরতির একা একা যাওয়াতে ওরা কি ভাবছে ! এরপর দুলাল গিয়ে

হাজির হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে না-কি ! হয়তো নানারকম প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে দুলালকে। চাই কি দুলালকে ওরা চুটিয়ে অপমানও করে দিতে পারে।

না, আরতি ওখানে ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা এ খবর নেবার জন্য বিকালের দিকেই একবার যাবে দুলাল। তখন বলা যাবে, সকালে সময় ছিল না, বিকেলে অফিস সেরে ও ফিরছে। এখন বরং হর্স পাওয়ারের কাছেই একবার যাওয়া যাক। হর্স পাওয়ারকে না পেলে সরাসরি থানার বড়বাবুর কাছেই যেতে হবে। বুবুদের ওপর এক হাত নিতে না পারলে কিছুতেই আরতির মনের ক্ষোভ মেটাতে পারবে না দুলাল।

উত্তেজনায় দুলাল পাজামা পরে ফেলল। গায়ে একটা পাঞ্জাবিও গলিয়ে ফেলল। জামাটা বড্ড নোংরা হয়ে আছে। বাক্স ঘেঁটে একটা ধোয়া জামা বার করে ফেললে হত। আরতি থাকলে নির্ঘাৎ ওকে এ জামা গায়ে বেরুতে দিত না। নির্ঘাৎ ওকে পাজামাটা পালটে নিতে বলত। পোশাক-আশাক সম্পর্কে আরতি বড্ড খুঁতখুঁতে। কিন্তু আরতি তো এখন নেই, দুলাল এ জামা গায়েই বেরুবে। দ্রুত চুলের ওপর একটু চিরুনি বুলিয়ে নিল দুলাল। তারপর দুমদাম ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এক পলক চোখে পড়ল, মা রান্না ঘরে উনুনে আঁচ দিতে বসেছে। দুলাল মাকে ডাকা প্রয়োজন মনে করল না। প্রচণ্ড এক অভিমানে দুমদাম বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

বেরিয়েই দুলালের গা-টা কেমন আবার ছমছম করে উঠল। অনেকদিন যেন ওর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগই ছিল না। শনিবার রাত থেকে সত্যি সত্যি ও বাড়ির বাইরে বেরয় নি। এ কদিনে পৃথিবীতে না জানি কত কিছু ঘটে গেছে। আজ কি বার মনে পড়ল না। যে বারই হোক এ কদিনে কত কিছু ঘটে গেল, অথচ তার জন্য বিন্দুমাত্র কোথাও চাঞ্চল্য নেই।

দুলাল দ্রুত কলোনিটা পার হয়ে বড় রাস্তার দিকে এসে পড়ল। ওর চায়ের দোকানের চিহ্নটা এখনো রয়ে গেছে। আবার বোধহয়

ওখানেই ওকে নতুন করে দোকান বসাতে হবে। আবার হয়তো ওখানেই মাছির মতো উঠতি মস্তানরা এসে ভিড় জমাবে। যাই হোক, এবার থেকে সাবধানে চলবে দুলাল। কাক-পক্ষীকেও ও টের পেতে দেবে না ওর মনের কথা।

দূর থেকে একটা বাস আসতে দেখে তৈরী হল দুলাল। হর্স পাওয়ারের বাড়িটা ওর চেনা। ওখানেই প্রথম গিয়ে হাজির হবে ও। হর্স পাওয়ারের কাছেই বুদ্ধি চাইতে হবে। পরিষ্কার সমস্ত ঘটনা হর্স পাওয়ারের সামনে তুলে ধরবে দুলাল। হয়তো এখনো ও হর্স পাওয়ারকে নিয়ে গিয়ে ঐ ভূতুড়ে বাগান বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু থমকে গেল দুলাল। সমস্ত ঘটনার কথা কি বলা যাবে? বললে যে আরতির প্রসঙ্গও এসে পড়বে। আরতিকে ওরা ওই জঘন্য জায়গায় তিন রাত আটকে রেখেছিল এ কথা কি বাইরের লোককে বলা উচিত? আরতির কথা কি গোপন রাখা উচিত নয় ওর?

হঠাৎ চমকে উঠল দুলাল, পেছন থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। কে রে বাবা!

দুলাল পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, বিন্দু। হাতে আঠার বাটি আর পোস্টার।

দুলালের মনে পড়ে গেল, বিন্দু এস. ইউ. সি. করত। ওর চায়ের দোকানে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চালাত এস. ইউ. সি-র হয়ে। আর ওদিকে ওর মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে ঘর মুছে সংসার চালায়। বিন্দুর সে জন্য লজ্জা নেই। বিন্দু জোর গলায় বলত, সর্বহারাদের আবার লজ্জা কী! সর্বহারার নেতৃত্বেই মানুষ জাগছে, জাগবে। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে ও।

দুলালের ধারণা ছিল বিন্দুটা যত বকবক করে, আসলে কাজের বেলা তত নয়। কিন্তু এখন ওর হাতে আঠার বাটি দেখে ওর ধারণাই পালটে গেল। ভারী অদ্ভুত লাগল দুলালের, বাড়িতে যার দু বেলা

খাবার সংস্থান নেই, সে রাজনীতি করে কি ভাবে! তা ছাড়া আজকালকার রাজনীতি মানেই তো জীবন নিয়ে খেলা। এ খেলায় নামতে সাহস পায় কি করে?

বিন্দু ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। সেই তখন থেকে তোমায় ডাকছি, শুনতে পাও না দুলালদা?

—আমাকে ডাকছিস! কেন? দুলাল দু' চোখে প্রশ্ন ঢেলে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তোমার নামে যা শুনলাম তা কি ঠিক?

দুলাল যেন সহসা একটা চাবুকের ঘা খেয়ে চমকে উঠল, আমার নামে! কি শুনেছিস? কোথায়?

—তোমাকে নাকি পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়?

—দুলাল আশ্বস্ত হল, তা হলে হয়তো অন্য কিছু জেনেছে ওরা, কে বললে তোকে?

—কবে ছাড়ল তোমাকে দুলালদা? বিন্দু, সবজান্তার মতো আবার প্রশ্ন করল।

দুলাল প্রসঙ্গ ঘোরাবার চেষ্টা করল, পোস্টার মারছিস, মারগে যা, আমার বাস আসছে।

সত্যি সত্যি বাসটা ততক্ষণে এগিয়ে এসে স্টপে দাঁড়িয়েছে। দুলাল যেন পালাতে পারলে বাঁচে। হন্তদন্ত হয়ে বাসে উঠে পড়ল।

দুলাল বুঝল, এ কদিন ও ঘরবন্দী থাকায় ওকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু ওকে থানায় তুলে নিয়ে গেছে এরকম ধারণা হল কি করে ওদের!

বিন্দু কি অন্য কথা বোঝাতে চাইল! দুলালের সঙ্গে থানার যোগাযোগ আছে, দুলাল আসলে থানারই লোক, এমন কোন কথা কি ও বোঝাতে চাইল! আবার কেমন পেটের ভিতর গুড়গুড় করে উঠল দুলালের। এ যেন আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়ে গেছে ওর চারপাশে।
এ অবস্থায় আবার হর্স পাওয়ারের কাছে যাওয়াটা কি উচিত হবে ওর!

তুলাল বুঝতে পারল না, হর্স পাওয়ারের কাছেই ওর যাওয়াটা উচিত কি না! যদি যায়, গিয়ে বুবুদের সম্পর্কে কি কি বলতে পারে ও? বুবুরা ওকে মারধর করেছে, বুবুরা ওর স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেছে, এ সব কথা হর্স পাওয়ারকে বলার পরিণতি কি হতে পারে বুঝতে পারল না তুলাল।

ফলে, একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল ও। এখনো তেমন বেলা হয়নি যে ওর অফিস যেতে বারণ। অফিসে গিয়ে সরকারবাবুকে একটা কিছু বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। চার পাঁচ দিন ওর অসুখ হয়েছিল বলেও ও চালিয়ে দিতে পারে।

তুলাল ঠিক করল, অফিসেই যাবে। বেরুবার আগে চট করে পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এলে ও ভাল করত। খাওয়ার ব্যাপারটা যে কোন হোটেলেই ও সেরে নিতে পারবে। কিন্তু একবার অফিসে গেলে সারাদিন আর স্নান হবে না ওর। না হোক স্নান, একদিন স্নান না করলে কিই বা এমন ক্ষতি।

তুলাল ঠিক করে ফেলল, ও অফিসেই যাবে। বিকেলের দিকে বরং বেলেঘাটা হয়ে ও বাড়ি ফিরবে। আরতি যতই ওর ওপর রাগ করে থাকুক, আরতিকে ও ভালভাবেই চেনে। আরতিকে ও আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনবে বাড়িতে। যত কঠিন কাজই হোক, ঠিক পারবে তুলাল।

কিন্তু আরতির পেটে যদি সত্যি সত্যি ভ্রূণ শিশু এসে ঠাঁই পেয়ে থাকে! তুলালের সারা শরীরে আবার একটা অদ্ভুত অনুভূতি গড়াতে শুরু করল। চোখের সামনে ভেসে উঠল অন্ধকার রাতের সেই বাগান বাড়িটা। ছমছমে অন্ধকারে গোটা তু' তিনেক মোম জ্বালিয়ে নরক তৈরি করে রেখেছিল সেই শুয়োরের বাচ্চাগুলি। চোখের ওপর ভেসে উঠল, বুবু নামে সেই লোকটাকে। চিবুকের কাছে কাঁকড়া লেগে থাকা গা শিউরে ওঠা একটা কাটা দাগ, কী অদ্ভুত শীতল ওর চোখের দৃষ্টি। মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার পর আবার অনায়াসে পুকুরের জলে সেই ছুরি ধুয়ে এনে ও স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই হাত উড়ে যাওয়া লোকটাকে। কেমন করে ওর হাতটা কনুই থেকে কাটা পড়ে গেছে কে জানে! নির্ঘাৎ বোমার ঘায়ে উড়ে গেছে। বোমা বানাতে গিয়ে হয়তো হাতের ওপর বোমা ফেটে গিয়েছিল। অথচ এ রকম একটা হাতের জন্য বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই ওর।

কী কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করছিল লোকটা। আর সেই এক মাথা ঝাঁকড়া চুলঅলা লম্বা হিলহিলে লোকটা। ও লোকটা যখন প্রথম ওকে পেছন থেকে ডাকল, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারে নি দুলাল। পারলে অত সহজে ও লোকটার হাতে ধরা দিত না। অত সহজে ও আরতির কাছ থেকেও সরে আসত না।

কিন্তু লোকটা যেন ওকে সম্মোহন করে ফেলেছিল। প্রাণের ভয়েই লোকটার সঙ্গে ওকে হেঁটে এগোতে হয়েছিল।

গা ঘুলোতে শুরু করল দুলালের। আরতি কী ওকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্যই মিছিমিছি ও-রকম সব আজেবাজে কথা বলল। দুলালকে বড় রকমের শাস্তি দিতে হলে ও-রকম কথাই বলা দরকার মনে করে কী আরতি ওর সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করল! আরতি তো নিজের চোখেই দেখেছে, দুলালকে ওরা ছেড়ে কথা বলে নি। কী জঘন্যভাবে ওর মুখের ওপর ওরা থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে, কী অমানুষের মতো ওকে কিল চড় লাথি কষিয়ে আধমরা করে ফেলেছিল, সবই তো দেখেছে আরতি। এরপরও কী দুলালের ওপর এতটুকু মায়া হয় নি আরতির! আশ্চর্য!

উত্তেজনায় বাস থেকে হঠাৎ নেমে পড়ল দুলাল। নামার পরই কেমন বোকা হয়ে গেল ও, এখানে নামলাম কেন! অফিসে যাব বলেই তো ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এখানে নামলাম কেন! অফিস চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুতে। অর্থাৎ এই বাসে শেয়ালদা অবধি যাওয়া যেত, তারপর সেখান থেকে কোন একটা ট্রামে বা বাসে। কোন কোনদিন শেয়ালদা থেকে হেঁটেও ও অফিস যায়। কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে কোনদিন

ওর খারাপ লাগে না। কিন্তু আজ আর হাঁটাহাঁটি ভালো লাগছিল না। রাস্তাটুকু যত সংক্ষেপে সারা যায় ততই ভালো। সেই ভেবেই ও শেয়ালদায় বাস পালটাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ এখানে বোকার মতো ঢুম করে নেমে পড়ল কেন!

এটা কোন জায়গা! একটু সময় লাগল ওর বুঝতে। ধেত্‌তেরি, এটা তো মৌলালি। এখনো শেয়ালদা বেশ দূর।

ফুটপাথের একপাশে স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে রইল ঢুলাল। এই মৌলালি থেকে বেলেঘাটার বাসও পাওয়া যেতে পারে।

অফিসের দিকে না গিয়ে বেলেঘাটার দিকে গেলে কেমন হয়! বেলেঘাটার বাড়িতে সবাই কেমন অবাক হয়ে যাবে। প্রথমে স্যুটকেস হাতে আরতি গিয়ে হাজির, তাইতেই ওদের বিস্ময়ের শেষ থাকবে না, এরপর আবার ঢুলালকে দেখলে—

আরতিদের বাড়িতে এতক্ষণ বোধহয় ঝড় বইতে শুরু করেছে। এর মধ্যে ঢুলালের কী ওখানে যাওয়া উচিত! ঢুলালকে ওরা অপমান করে তাড়িয়ে দেবে না তো! কে জানে, আরতি এরই মধ্যে ও বাড়িতে গিয়ে কি কি বলে ফেলেছে।

বিশ্বাস হয় না, আরতি বুবুদের কথা কাউকে বলতে পারে। আরতি যদি ও সব কথা না বলে ঢুলু আর তার মায়ের কথা বলে থাকে, তাহলে বাঁচা যায়। সংসারে সব শ্বশুর শাশুড়ীই যে ভালো হবে, এমন কথা নয়। ও-বাড়ির লোক নিশ্চয়ই আরতিকে বোঝাবার চেষ্টা করবে, যতই খারাপ হোক শাশুড়ী, ওটাই আরতিকে মানিয়ে নিতে হবে। ঢুলাল যদি এ সময় গিয়ে হাজির হয়, তা হলে কি খারাপ হবে!

ঢুলালের মনে হল, অফিস যাওয়ার আগে একবার ওর বেলেঘাটাতেই যাওয়া উচিত। তা ছাড়া আরতি ঠিক মতো পৌঁছেছে কিনা সেটাও ওর জেনে নেওয়া উচিত।

ঢুলাল চারপাশে একবার তাকায়। এপাশ-ওপাশ ছড়ানো মানুষ, ফুটপাত জুড়ে হকার, চেঁচামেচি, ব্যস্ততা। এত মানুষ, অথচ একটাও

চেনা মুখ চোখে পড়ছে না, এই যা ভরসা। সবাই যেন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তবু মুখগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার চেষ্টা করে দুলাল ; না, কাউকেই তেমন মারাত্মক বলে মনে হয় না অবশ্য বাইরের চেহারাতে সব সময় সব কিছু বোঝাও যায় না। কে জানে, এদেরও মধ্যে কারো কারো জামার নিচে ছুরি বোমা পাইপগান লুকোন আছে কি না! থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব। অবিশ্বাস করার মতো কিছুই আর রইল না পৃথিবীতে।

বাসের জন্য বহুদূর অবধি চোখ পাতে দুলাল পর পর কয়েকটা লরি এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে বোঝার উপায় নেই, বাস আসছে কি না! ট্রামও নেই, কোথায় যে সব জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে!

হঠাৎই একটু চমকে ওঠে। শরীরটা মুহূর্তেই কেমন একটু কেঁপে ওঠে, কে রে বাবা, রাস্তার ওপাশে ঐ ঝুপড়িটার দিকে কে যেন চকিতেই আড়াল হওয়ার চেষ্টা করল না! দুলালকে দেখতে পেয়েই কী লোকটা গা ঢাকা দিল!

মুহূর্তের মধ্যেই কেমন যেন ঘামতে শুরু করে দুলাল। কে হতে পারে লোকটা? বুবুদের দলের কেউ কি! বুবুরা কী এখনো ওকে চোখে চোখে রেখেছে! তাই যদি হয়, তা হলে হর্স পাওয়ারের বাড়ির দিকে না গিয়ে বড় জোর বেঁচে গেছে ও। আজই নির্ঘাৎ ও হাতেনাতে ধরা পড়ে যেত আবার। কথাটা ভাবতেই কেমন গা বমি বমি করে ওঠে দুলালের।

নাহ্, যে কোন একটা বাস এলেই ও উঠে পালাতে পারত। অথচ একটারও দেখা নেই দুলাল আবার ঝুপড়িটার দিকে তাকায়, আর এই সময় আবার সেই লোকটা। হ্যাঁ, সেই লোকটাই তো! কিন্তু ও তো ফলআলা-টলআলা হবে। হয়তো হল্লাগাড়ির ভয়ে ও-ভাবে ঝুপড়ির পাশে লুকিয়ে পড়েছিল। শালা! কেমন অস্ফুট আবৃত্তি করে দুলাল, এমন চমকিয়ে দিয়েছিল, বাপস্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দুলালের।

॥ এগারো ॥

বেলেঘাটার এই সরু গলিটার মধ্যে ঢুকলেই দুলাল একটু অন্যরকম হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় আরতিকে দেখতে আসার দিনটার কথা। কী থমথমে অবস্থাই না সেদিন জড়িয়ে ছিল এই গলিতে। দুলালরা তারই মধ্যে আরতিদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। বড় রাস্তার মোড়ে অতবড় যে একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেছে বিন্দুমাত্র ওরা জানতে পারে নি আগে। যদি টের পেত, তা হলে বাস থেকে নামার পর আর ওরা এ গলিতে ঢুকত না। পত্রপাঠ বিদেয় হয়ে যেত। আর তা হলে আরতিকে দেখার কোন প্রশ্নই আসত না। আরতির সঙ্গে কোন সম্পর্কই গড়ে উঠত না ওদের। একেই বলে কপালের লেখা। যার সঙ্গে যার লেখা থাকে তার সঙ্গে তার হবেই। স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও তা খণ্ডাতে পারে না।

কিন্তু সেদিনকার মতো আজও এত ভয় ভয় লাগছে কেন! এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে। দিব্যি খটখটে দিন, বাড়ির জানলাকপাট সবই আজ অবাধ। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে এরই মধ্যে সারা রাস্তা জুড়ে ছুটোছুটি করে খেলছে। অথচ আজও যেন সেই প্রথম দিনেরই মতো অনুভূতি। বুকের ভেতব গুড়গুড় করে কাঁপছে দুলালের। কী জানি, আরতিদের বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন অভ্যর্থনা পাবে ও!

বাড়ির কাছাকাছি এসে এক পলক দাঁড়ায় দুলাল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়ে গলায় মুখে অল্প অল্প ঘষে ঘাম মুছে নেয়। ওকে কী খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে! খুব ছন্নছাড়া মতো মনে হচ্ছে কী! হতেও পারে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সেই কখন থেকে। বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে বেরুনো উচিত ছিল ওর। তা না করে হুট করে বেরিয়ে পড়েছে। মাকেও বলা প্রয়োজন মনে করে নি, কোথায় যাচ্ছে। মা কি তাহলে

এতক্ষণ ওর জন্য ভাবতে শুরু করেছে। চুলোয় যাক, ভাবুক গে মা! যে মা ওদের অবস্থাটা বুঝতে পারে না, তার সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করাই ভাল। দুলাল আবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারপর আর অপেক্ষা না করে গটগট করে আরতিদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে আলতো করে একটু চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। এটা বাইরের ঘর। দুলাল দেখল, ঘর ফাঁকা, কেউ নেই। ভেতরের দরজা দিয়ে ওপাশে রয়েছে আর একটা ঘর। ওটাই বড় ঘর। শ্বশুর শাশুড়ী ওখানে থাকেন। ও ঘরেরই একদিকে বাথরুম পায়খানা, অপরদিকে রান্নাঘর।

ভেতরে ওপাশে যাবে কিনা একবার ভাবল দুলাল। এ বাড়িতে ওর অবাধ গতি, কিন্তু আজ কেমন যেন ও বাইরের লোক হয়ে গেছে। কেমন যেন বাধ বাধ লাগে দুলালের। বরং ও যে এসেছে এটা শব্দ করে একবার জানিয়ে দিলে কেমন হয়!

দুলাল অল্প একটু কেসে গলা পরিষ্কার করল, পরে ভারতীর নাম ধরে একবার ডাকল। তারপর বসে পড়ল সোফায়।

— ওমা, তুমি কখন এলে! ভারতীর বদলে মা। মলিনাদেবী।

দুলালকে দেখে যেন চমকে উঠেছেন।

দুলাল সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। মুখে মলিন একটু হাসি ছড়িয়ে এগিয়ে গেল, এই তো এলাম। প্রণাম করল মলিনাদেবীকে। আজ আর অফিসে যাই নি।

ততক্ষণে ভারতীও এসে হাজির। ওমা, আপনি কখন! আজ আমাদের কী ভাগ্য। না চাইতেই বৃষ্টি হচ্ছে।

দুলাল বুঝতে পারল না, আরতি এসে পৌঁছেছে কিনা। অথচ জিজ্ঞেসও করা যায় না। বোকার মতো একটু হাসে।

—বসো বাবা, বসো! তারপর কি হয়েছে বলো দেখি, আরতি অমন হুট করে চলে এল! তাও আবার একা একা! তোমরা ওকে একা আসতে দিলে! কি আক্কেল তোমাদের!

—দুলাল কী যে বলবে বুঝতে পারল না।

—না মানে, ইয়ে, আমি তো সে জন্যই অফিসে না গিয়ে এখানে ছুটে এলাম।

—তা তো এলে, কিন্তু কি হয়েছে বলো দেখি? কেমন এক উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন মলিনাদেবী।

দুলাল কেমন বিপাকে পড়ে গেল, কি বলতে কি হয়ে যাবে। তাছাড়া আরতি এখানে এসে কি কি বলেছে তাও জানা নেই। তার চে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। দুলাল আবার বোকার মতো একটু হাসে, ও কিছু না। আরতি কিছু বলে নি?

—বলবে কি, দিদি তো কেঁদেই কুল পাচ্ছে না। ভারতীর চোখেও জিজ্ঞাসা। বিস্ময়।

দুলাল শুধায়, কিছুই বলে নি? ঠিক আছে, আমি পরেই সব বলব'খন! এখন ওসব আলোচনা না করাই ভালো।

—ও মাগো, ও আবার কী কথা! না বাপু, আমার কিছু ভাল লাগছে না। মেয়েটা অত বড় একটা সুটকেস কাঁধে এল! আর—

দুলাল এ সময় আবার একটু ফিকে হেসে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, তারপর ভারতীর দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার দিদির যে এত অল্পতেই মাথা খারাপ হয়! যাক গে, আমি তো এসে পড়েছি, ও কিছু না।

—তুমি বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছো দুলাল? প্রশ্ন করলেন মলিনাদেবী।

দুলাল ভাববাচ্যে উত্তর দিল, খেলেও হয়, না খেলেও অবশ্য ক্ষতি নেই।

—ও মা, ও আবার কী কথা! তোমরা সব রামকৃষ্ণ হয়ে গেলে দেখছি। চানটান করে বেরিয়েছো তো? দেখে তো মনে হচ্ছে না!

দুলাল বলল, সময় আর পেলাম কোথায়! আরতি বেরিয়ে আসার পরই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। অফিসে যাওয়া হল না।

মলিনাদেবী আরো কিছুক্ষণ দুলালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভারতীকে বললেন, তুই হাঁ করে দেখছিস কি? যা, তোয়ালে টোয়ালে বার করে দে, চান করে আসুক। তুমি চান করে এসো বাবা, যা রান্না হয়েছে, তাই চারটে খেয়ে নাও।

উনি চলে গেলেন। ভারতী এগিয়ে আসে। দুলালের পাশটিতে গায় গায় সেঁটে বসে পড়ে, কি হয়েছে বলুন তো জামাইবাবু? এই সকাল সকাল গরিবের বাড়িতে আপনাদের দু'জনের পায়ের ধুলো পড়ল?

দুলাল আবার হাসবার চেষ্টা করে, বলব'খন। অত তাড়া কিসের। তোমার কলেজ-টলেজ কি রকম হচ্ছে শুনি! কলেজের সেই হিরোটির খবর কি?

ভারতী বলল, হিরোটি নায়িকা পালটেছে, পরের ছবিতে হয়তো আবার একবার পালটাবে। কিন্তু সে কথা থাক, দিদির কি হয়েছে বলবেন না?

—বলব না কেন! দুলাল কিছুতেই যেন ছাড়া পাচ্ছে না। একটা কিছু বানিয়ে বানিয়ে না বলে এবার উপায় নেই। কিন্তু এর মধ্যে আরতির সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে পারলে ভালো হত। অন্তত আরতি এখানে এসে কি কি বলেছে জেনে নিতে পারলে সুবিধে হত ওর। দুলাল বলল, তোমার দিদি বুঝি খুব কান্নাকাটি করছে?

—ওই তো ও ঘরে এসে শুয়ে আছে। কি যে হয়েছে, কিছুই বলে না, কেবল কাঁদছে।

দুলাল বিচিত্র ভঙ্গিতে এবার একটু হাসে, পাগল। তোমার দিদির কথা আর বোলো না। আমার মা ওকে কী না কী বলেছে, ব্যস তাইতেই অত অভিমান। আচ্ছা তুমিই বলো, শাশুড়ীরা ছেলের বউদের যেমন ভালোবাসবে, তেমনি আবার শাসনও তো করবে। মা আমাকেও তো কত বকে। তাই বলে—

ভারতি কেমন ভাসা-ভাসা চোখে তাকিয়ে থাকে। ভাবখানা

এরকম যেন শ্বশুর শাউড়ীর কথা ও কী করে বুঝবে! ওর তো এখনো বিয়েই হয় নি।

দুলাল আর এ ব্যাপারে এগোয় না। চারপাশে চকিতে একবার তাকায়, তোমার বাবাকে দেখছি না? বাবা কোথায়?

—বাবা বেরিয়েছে। ইলেকট্রিক অফিসে বিল জমা দেবে।

—উনি আরতিকে দেখে যান নি? জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় দুলাল।

ভারতী বলল, না। এসেই দেখতে পাবে। তবু ভাল আপনি এসে গেছেন, নইলে কুরুক্ষেত্র লেগে যেত। বাবা এ সব একেবারে পছন্দ করে না।

—কি সব?

ভারতী হাসে, এই যে দিদি একা একা চলে এল। বাবা জানতে পারলে খুব রাগ করবে।

রান্নাঘর থেকে এসময় আবার মায়ের গলা ভেসে এল, কি হল তোদের? এই ভারতী, দুলালকে চান করতে বল। আরতিকেও উঠতে বল। বেলা বাড়ে না কমে।

ভারতী উঠে দাঁড়ায়, দিদির সঙ্গে দেখা করে আসুন। তারপর বাথরুম সেরে নিন দেখি, আজ তো অফিস কামাই, আজ দুপুরে আপনাকে ব্রে বানাব।

দুলাল আবার একটু বোকার মতো হাসে, তাসফাস ছেড়ে দিয়েছি।

—ইস রে, ছাড়লেই হল, না! উঠুন দেখি, আমি তোয়ালে রেখে আসছি বাথরুমে, আপনি আসুন।

দুলাল উঠে দাঁড়ায়। ওর জামা কাপড় সত্যি সত্যি বড় নোংরা। এগুলো পরে না বেরনই উচিত ছিল। বিশেষ করে এ বেশে কেউ শ্বশুরবাড়ি আসে না। শ্বশুরবাড়ি যদি পুরনো হয়ে যায় তা হলে সে এক কথা। কিন্তু দুলাল এখনো এ বাড়ির নতুন জামাই।

নিজের ধুলো লাগা পাঞ্জাবিটাকে একটু ঝেড়ে নেবার চেষ্টা করে দুলাল। কিন্তু কোন লাভ নেই। অবশেষে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

ওপাশের ঘরে একটা পর্দা ঝুলছে, আরতি ও ঘরেই রয়েছে। দুলাল বুঝতে পারল না, তুম করে ও ঘরে ঢুকে পড়াটা উচিত হবে কিনা।

ওদিকে রান্নাঘরে মাকে দেখতে পেল দুলাল। মা কড়াইতে কি যেন চাপাচ্ছে। খুবই ব্যস্ত। দুলাল রান্নাঘরের দিকে এগোতে গিয়েও আবার পিছিয়ে এল। তারপর পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল আরতির ঘরে।

ঢুকে মুহূর্ত খানেক থমকে রইল। হ্যাঁ, ওই তো আরতি। বাড়ি থেকে যে শাড়িটা পরে বেরিয়েছিল, সেটাই ওর পরনে রয়েছে। ওই অবস্থাতেই ও ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে রেখেছে আরতি। ঘাড়ের খানিকটা অংশ পিঠের খোলা চুলে ঢেকে রয়েছে, খানিকটা অংশ চোখে পড়ল। অত্যন্ত পরিচিত এই ঘাড়ের গঠন। অত্যন্ত পরিচিত রঙ। অথচ কত দুর্লভ মনে হচ্ছে ঐ পরিচিত অংশটুকু।

দুলাল দেখল, আরতির সাদা ধবধবে পা দুটো উন্মুক্ত হয়ে আছে। কত নিশ্চিন্তে পায়ের অতখানি অংশ উন্মুক্ত করে রেখেছে ও। এমন দৃশ্য দুলাল যদি ওদের কাটাপুকুরের বাড়িতে দেখতে পেত, ওই পা দুটোকে নিয়ে ও খেলা করত। না, আরতির কোন বাধাই ও মানত না।

কিন্তু পাথরের মতো এখন দাঁড়িয়ে রইল দুলাল। আরতি কি টের পায় নি ও এসেছে। টের পেলেও কি ওই ভাবে শুয়ে থাকতে পারে. অসম্ভব। যত রাগ বা ক্ষোভই থাক না, আরতি এ মুহূর্তে দুলালকে টের পেলে নিজেকে সংযত করে ফেলত। নির্ঘাৎ উঠে বসে শাড়ি ঠিক করে নিত।

দুলাল আরো একটু ইতস্তত করে পরে অত্যন্ত নরমভাবে ডাকল, আরতি!

আরতি শান্তভাবে মাথা তুলল, এক পলক দেখল দুলালকে। কিন্তু ব্যস ওইটুকুই। আবার মাথা নামিয়ে নিল বালিশে।

—আরতি! আবার ডাকল দুলাল।

—কি বলতে এসেছো বলো? আরতি উঠে বসল। কেমন থমথমে মুখ।

তুলাল আরতির চোখের দিকে তাকাল। আরতির ও চোখের পাতায় অত গাম্ভীর্য এসে জমা হতে পারে, ও ভাবতেই পারে না। সত্যিই তো, কি বলার আছে ওর। কি বলতে এসেছে তুলাল! কিন্তু কিছু একটা বলতেই হবে। তুলাল গলার স্বর আরো নরম করে বলল, তুমি মিছিমিছি রাগ করছ আরতি। যা হয়েছে তা আমাদের ভাগ্যে ছিল তাই।

আরতির কোন বিকার নেই। শুনে যায়, আর কিছু বলবে?

—তুমি অমন করে চলে এলে কেন আরতি! কতবার তো বললাম, আমারই অন্যায় হয়েছে। আমিই সব দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। অথচ—

—আমার মতো নোংরা মেয়েকে নিয়ে তোমাদের ঘর করতে অসুবিধা হবে না? আরতি ফুঁসে উঠল।

—নোংরা। আমি তোমাকে নোংরা বলি নি। মাকে তো তুমি চেন আরতি। জেনে শুনেও—

—আমি কাউকে আর চিনতে চাই না। আমার যা বলার আমি বলেছি।

—আমার সঙ্গেই ফিরে চলো আরতি। মা তখন খুব রাগারাগি করেছেন ঠিক, কিন্তু মায়ের মনও ভাল নয়। তা ছাড়া তোমাদের বাড়ির লোকই বা কি ভাবছে?

—আমাদের বাড়ির লোকের জন্য তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।

তুলাল স্থির হয়ে গেল

—তা ছাড়া আমাকে তোমাদের এত অবিশ্বাস। আরো আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

—অবিশ্বাস! কী বলছ আরতি! কে তোমাকে অবিশ্বাস করেছে?

—অবিশ্বাস নয়, আমার কাছে সব কথা গোপন করেছিলে কেন?

—কি কথা? তুলাল বুঝতে পারছিল না, কি বলতে চাইছে ও।

—থাক, আমি আর ওসব নিয়ে কথা বলতে চাই না। খুব হয়েছে আমার।

—কি কথা, বলো না? আমি কিন্তু কক্ষনো তোমাকে অবিশ্বাস করি নি আরতি। বিশ্বাস কর। কক্ষনো না।

—জগদীশের সঙ্গে তুমি কোথায় যেতে? কি করতে ওর সঙ্গে? সরাসরি প্রশ্ন করল আরতি।

—কোথায় যাবো! এই ছাখো, কী পাগল!

—জগদীশ খুন হল কেন?

—কী মুশকিল, জগদীশকে কি আমি খুন করেছি বলতে চাও?

—সে ক্ষমতা তোমার হবে না আমি জানি, কিন্তু তুমি পুলিসের স্পাই। লজ্জা হয় না, জগদীশ যা নয়, তাই তুমি বলে আসতে পুলিসের কাছে।

মাথায় ঝাঁ করে রক্ত উঠল দুলালের। তবে কি বুবুরাই এ সব কথা বলেছে আরতিকে। তবে কি বুবুদের ধারণা জগদীশের মৃত্যুর জন্য দুলালই দায়ী।

কিন্তু দুলাল সহজ হবারই চেষ্টা করে, ওরা মিথ্যে কথা বলেছে। জগদীশকে কে মারল আমি কিছুই জানি না। জানার কথাও নয়।

এমন সময় পর্দার ওপাশ থেকে ভারতীর গলা পাওয়া গেল, জামাইবাবু, বাথরুম রেডি।

ভারতীকে উত্তর দেওয়া উচিত। কিন্তু স্থবিরতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখল। দুলাল উত্তর দিতে ভুলে গেল।

আরতি উঠে পড়ল বিছানা থেকে। গায়ের কাপড়টা ঠিক করে গুছিয়ে নিতে নিতে ঘর থেকে বাইরে বেরুবার জন্য এগোল আরতি।

দুলাল দরজা আগলে দাঁড়ায়, বিশ্বাস কর আরতি, জগদীশের ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবু কেন আমি ওর সঙ্গে মিশতাম যদি শুনতে চাও, আমি সব বলব তোমাকে।

—তোমাকে চান করতে ডাকছে। আরতি দুলালকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

এমন সময় দুলাল আবার চমকে ওঠে, শ্বশুরমশায় বৃন্দাবনবাবু বোধহয় এতক্ষণে ফিরেছেন। সামনের ঘর থেকে ওরকমই একটা গলার আওয়াজ পেল দুলাল। এই লোকটাকেই ওর এ বাড়িতে সব চেয়ে ভয়।

দুলাল আর অপেক্ষা করল না। বৃন্দাবনবাবুর মুখোমুখি হওয়ার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

ঢুকে খানিকক্ষণ শিঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন পালাবার জন্যই ছুটে এসে বাথরুমে ঢুকেছে। বাথরুমে আশ্রয় না নিলে এখনই ও বৃন্দাবন-বাবুর মুখোমুখি পড়ে যেত। আর তা হলে একগাদা প্রশ্নের জবাব দিতে হত ওকে। কিন্তু কি জবাব দেবে দুলাল, জবাব যে দিতে পারত, সেই আরতিই এখন বিগড়ে আছে। আরতিকে যতক্ষণ ও সহজ করে তুলতে না পারবে, ততক্ষণ কোন জবাবই ওর যুতসই হবে না। হতে পারে না।

অথচ কীভাবে ও আরতিকে বোঝাবে। আর কীভাবে বোঝাতে পারে! তাছাড়া এ বাড়িতে আরতির সঙ্গে কথা বলার সুযোগই বা ওর কতটুকু। লুকিয়ে-চুরিয়ে কখনো এসব কথা হয় না। এক হতে পারে কোন এক ছুতো ধরে রাতেও যদি এখানে থেকে যাওয়া যায়। তা হলে সারারাত নিজের অপরাধ স্বীকার করে আরতিকে আবার বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে দুলাল। দরকার হয়, আরতির নরম পা দুটোকে বুকে জড়িয়ে সারারাত ও পড়ে থাকবে। এরপরও কি আরতি ক্ষমা করবে না! এতদিনকার একসঙ্গে থাকা সব কি তাহলে মিথ্যে!

কিন্তু কি অজুহাতে দুলাল এখানে রাত কাটাবে! ভারতীরাই বা কি ভাববে! এমনিতেই ওকে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করে ভারতী, এরপর হয়তো স্ত্রৈণ বলতে শুরু করবে। মেয়েরা কি চায় না, পুরুষরা স্ত্রৈণ হোক।

তাছাড়া আরতি তো রাজী নাও হতে পারে। আরতি ভাবতে পারে, দুলালের এখানে হ্যাংলার মতো থাকাটা ঠিক হবে না। সে রকম অবস্থায় সত্যি সত্যি কিভাবে এখানে রাত কাটাবে দুলাল। সব কেমন গোলমেলে হয়ে যায় ওর।

ঠিক এই সময় আবার ওর মায়ের কথা মনে পড়ল, মাকেও বলে আসা হয় নি। রাতে বাড়ি না ফিরলে মা হয়তো সারা পাড়া মাতিয়ে হৈচৈ বাধিয়ে দেবে। দিনকাল এমন নয় যে বাড়িতে না ফিরলে কেউ দুশ্চিন্তা করবে না। তাছাড়া সন্ধ্যার দিকে মাকে গিয়ে বলে আসাও সম্ভব নয়। আরতির পেছন পেছন দুলাল বেলেঘাটাতেই এসেছে জানলে মা আবার লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসবে। এমন খিটখিটে স্বভাবের মানুষ দুলাল আর দুটি দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।

কেমন বিরক্তি এসে চেপে ধরে ওকে, কেমন এক হতাশা। কিন্তু এভাবে এই বাথরুমেও লুকিয়ে থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে! এখনই হয়তো ওপাশ থেকে তাড়া লাগাবে ভারতী। কে জানে, ওদেরও স্নানটান হয়েছে কিনা!

দুলাল হুটপাট করে স্নান সেরে নেওয়ার জন্য গায়ের জামা কাপড় খুলে ফেলল। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে ঝুপঝাপ মাথায় ঢালতে শুরু করে দিল। আহ্, গায়ে জল ঢালার বেশ প্রয়োজন ছিল ওর। গাটা যেন জুড়িয়ে যেতে লাগল।

বারো॥

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতেই বেলা দুটো বেজে গেল। এ বাড়িতে আরতি বলে যে কেউ আছে টেরই পাওয়া যাচ্ছিল না। আরতি যেন ইচ্ছে করেই দুলালের কাছ থেকে সরে সরে যাচ্ছিল।

দু'একবার এদিক-ওদিক করে আরতির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা

করেছে দুলাল, কিন্তু কী আশ্চর্য! এ কোন আরতি! এর সঙ্গে কি কোনকালে পরিচয় ছিল ওর! এ কি সেই আরতি, যাকে নিয়ে কাটা-পুকুর কলোনির ঘরে শুয়ে কত কী স্বপ্ন দেখত দুলাল। কত কথা হত ওদের মধ্যে।

আসলে আরতি যেন ইচ্ছে করেই ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। এমন ভাব করছে, যেন দুলালের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না ও। সত্যি সত্যি কি সম্পর্ক রাখতে চায় না আরতি! কথাটা ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগে দুলালের। আরতির পক্ষে সম্পর্ক ছেদ করা কী অত সহজ! দুলালরা যত দোষই করুক, আরতির জীবন ওদের সঙ্গেই বাঁধা! দুলালদের যা ভবিষ্যৎ, আরতির ভবিষ্যৎও তো তাই। তাহলে!

আসলে দুলাল বোঝে, কয়েকটা দিন না কাটলে কিছুতেই সহজ হতে পারবে না আরতি। অভিমানে এখন নিজের মধ্যেই গুমরিয়ে মরছে ও। এ অবস্থায় যে ভাবেই হোক ওকে আরো দশটা কাজের মধ্যে ভিড়িয়ে দেওয়া দরকার। আরতিকে আরো কাছে পাওয়া দরকার। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়! আরতি যেন ওকে চিনতেই পারছে না!

খেতে বসে বৃন্দাবনবাবুর মুখোমুখি পড়েছিল দুলাল। মুখ তুলে তাকায় নি। লোকটা বড় কাটা কাটা প্রশ্ন করেন। হুঁ হাঁ উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে দুলাল।

কিন্তু লোকটাও নাছোড়বান্দা, তোমার কি আজ ছুটি ছিল দুলাল?

দুলালের অস্বস্তি বাড়ে, কই, না তো। এ প্রসঙ্গটা না উঠলেই ভালো ছিল।

—তবে অফিস যাও নি?

একটা কিছু উত্তর দিতেই হয়, দুলাল দায়সারাভাবে বলে, এমনি যাই নি, কাল যাবো।

—এমনি যাও নি! কেমন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন উনি। শরীর-টরীর খারাপ নয় তো? নাকি কোন গোলমাল করেছ অফিসে?

—না না, গোলমাল করব কেন, এমনিই যাই নি।

বৃন্দাবনবাবু আরো কিছুক্ষণ থমকে রইলেন। তারপর একগাদা উপদেশ দিলেন ওকে। উপদেশ দেওয়ার সুযোগ পেলে কেউ আর থামতেই চায় না।

যাই হোক, খাওয়ার পর বৃন্দাবনবাবু ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। দুলালের জন্য ওখানে জায়গা করে দিয়েছিল ভারতী, কিন্তু অসম্ভব! একটু নির্জনে না থাকতে পারলে আর বাঁচা যাবে না। তাছাড়া ওই আরতির বাবাটাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে থাকাই ভালো। কে আর মিছিমিছি ধরা দিয়ে বিব্রত হতে চায়।

বাইরের ঘরে দুলাল সোফাতে বসে থাকে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই আরতিদেরও খাওয়া হয়ে গেছে। একটি বারের জন্য আরতি কি এখন এদিকে আসতে পারে না! আরতি যদি আসত, তা হলে চুপিচুপি ওকে বলা যেত আজকের রাতটা ও এ বাড়িতেই থাকতে চায়। এ কথা আরতিকে বলা ছাড়া আর কাকেই বা বলবে ও।

দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দুলাল। আরো কয়েক পলক কেটে যায়। এমন সময় হাতে পান নিয়ে ঘরে ঢোকে ভারতী। মিষ্টি মিষ্টি চোখ, এই যে মশাই, বসে বসে কার ধ্যান করছেন? আপনার জায়গা করে দিয়েছি ও ঘরে, বিশ্রাম করবেন না?

দুলাল উত্তর খুঁজে পেল না। ভারতীর দিকে তাকিয়ে থেকেও ওর মনে হল না ও ভারতীকে দেখতে পাচ্ছে।

—কি হল, কার ধ্যান করছেন?

এবার কেমন যেন চমকে ওঠে দুলাল, কই, না তো! কার আবার ধ্যান করব। কে আছে?

—ধ্যান করছেন না? ভারতী রহস্য করে একটু হেসে নিল। নিন, পান নিন। খয়ের ছাড়াই দিয়েছি।

দুলাল হাত বাড়ায়, কিন্তু পরক্ষণেই আবার হাতটা গুটিয়ে নেয়, না থাক, খাব না।

—সে কি ! এত যত্ন করে সেজে আনলাম। না হয় আমিই সেজেছি, নিন না।

ছুলাল ওর হাতটা সরিয়ে দেয়। না থাক! ভালো লাগছে না।

—আপনার কি হয়েছে বলুন দেখি? ভারতী কিছুটা সিরিয়স হওয়ার চেষ্টা করে এবার।

ছুলাল বলে, নেশা না করাই ভালো।

—নেশা! পান খেলে নেশা হয়?

—একটা ছুটো খেলে অবশ্য হয় না, কিন্তু না, থাক। ওটা বরং তুমি তোমার দিদিকেই দিয়ে এসো।

—দিদিকে! ভারতী এবার চোখ ছুটোকে কুটিল করে তোলে। হাসে।

ছুলাল আবার একটু দমে যায়। হাসছ যে? একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে ছুলাল। পরক্ষণেই ভাবে, আরতির প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে, তখন একটা হেস্তনেস্ত করে নেওয়াই ভালো। বলল, তোমার দিদিরই পানের নেশা, ওকেই দাও গে যাও।

ভারতীও কম যায় না, সঙ্গে সঙ্গে বলে, তাহলে আপনিই দিয়ে আসুন না, আমি দিতে গিয়ে কেন বাবা মিছিমিছি বকুনি খাই।

—কেন, বকবে কেন? বকবে না, যাও না দিয়ে এসো। প্লিজ।

ভারতী ধপ করে ছুলালের পাশেই বসে পড়ল, অত কঠিন কাজ আমি করতে পারি না মশাই। এখানে এসে অবধি মুখটাকে এমন হাঁড়ি করে রেখেছে যে কথা বলতেও ভয় হয়। কেন মিছিমিছি আমাকে জড়াচ্ছেন?

ছুলাল ঢোক গিলল, না না, তুমি মিছিমিছি ওসব ভাবছ। ও কিছু না।

—মিছিমিছি, উরি ব্বাস! তারপর একটু থেমে হাসে ভারতী, ওসব আপনাদের ব্যাপার মশাই। রাজারানীর ব্যাপার। ওর মধ্যে আমি নেই।

দুলালের জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আরতি এখন কোথায়, কি করছে আরতি। কিন্তু না, আর বেশি আগ্রহ দেখান শোভা পায় না। বরং সাফাই গাইবার জন্য বলল, আসলে ক'দিন থেকে ওর শরীরটা ভালো নেই। সেজন্যই হয়তো মেজাজ খারাপ।

ভারতীও হাসে, তা না হয় হল, কিন্তু কি করে হাসি ফোটাব বলুন। ও কি আমার কাজ। যেখানে আপনিই ফেল পড়ে গেলেন।

দুলাল আবার অসহায় বোধ করে। চুপসে যায়। আরতি এমনিতেই কোন দিন খুব একটা উচ্ছল নয়, কিন্তু তাই বলে গাল ভারী করে বসে থাকার মেয়েও নয় আরতি। বুবুরাই আসলে তছনছ করে দিয়ে গেছে। শালারা আরতির মতো মেয়েদের গায়ে হাত তুলতেও পাপ বোধ করে না। দুলালের যদি ক্ষমতা থাকত, একবার দেখে নিত শালাদের। কিন্তু—

হঠাৎ দরজার ওপাশে গলিতে একটা ট্যাক্সি থামার শব্দ পেল ওরা। কৌতুকে দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ থাকায় সত্যি সত্যি বোঝা গেল না, এ বাড়িতেই কেউ এল কি না!

ভারতী ততক্ষণে লাফিয়ে জানলার কাছে চলে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই ওর চোখমুখ ঝলসে উঠল, চিনিমাসি, চিনিমাসি, চিনিমাসি এসেছে। বলতে বলতে দরজা খুলল ভারতী।

দুলাল আবার কেমন গুটিয়ে গেল। চিনিমাসি বলতে আসানসোলের সেই মাসি কি, তার মানে বারোটা বাজল। আরতির সঙ্গে যাও বা একটু কথা বলার সুযোগ ছিল, সব গেল। একে তো দুটো ঘর, তার মধ্যে যদি আবার উটকো লোকের ভিড় বাড়ে, তাহলে এখানে রাতে থেকে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠবে না। দুলাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ভারতীর চেঁচামেচিতে ততক্ষণে মলিনাদেবীও ছুটে এসেছেন। কি, কি হয়েছে? দরজার দিকে গিয়ে উনিও হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দুলাল উঠে দাঁড়াবার কথাও যেন ভুলে গেল।

হ্যাঁ, চিনিমাসিই। মাসির স্যুটকেস নিয়ে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল ভারতী। চিনিমাসি কেবল একাই নন, সঙ্গে ওর বাচ্চা পুপুটাও। এরা যে থাকতেই এসেছে সন্দেহ নেই। পুপুকে দু হাতে কোলে তুলে নিলেন মলিনাদেবী।

দুলালের উচিত এখন উঠে গিয়ে চিনিমাসির পায়ের ধুলো নেওয়া। যত বিরক্তিই থাক, সামাজিকতাটুকু রক্ষা করা উচিত। ফলে, দুলাল উঠে গিয়ে পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলল, ভালো আছেন? আসানসোল থেকেই এলেন বুঝি?

চিনিমাসিও হাসলেন, তা আর কি করি! তোমরা তো কেউ আমাদের খবর নেবে না. তাই আমাকেই আসতে হল।

এরপর কি বলতে হয় ভুলে গেল দুলাল। আবার সোফায় বসে তাকিয়ে থাকল, যেন ভূত দেখছে।

—তোমাদের খবর ভালো তো? আরতি কই? আরতি আসে নি?

শাশুড়ীই জবাব দিলেন, এসেছে, আজ সকালেই ওরা এসেছে।

ভারতী হাওড়া স্টেশনের কুলিদের মতো স্যুটকেসটা মাথায় তুলে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে শুধাল. মেসো এলেন না?

—ওর কথা ওকেই জিজ্ঞেস করিস।

মলিনাদেবী শুধোলেন, আসবে বলে তো চিঠি লিখেছিলি?

—তা লিখেছিলাম, তবে দেখলে তো, আসব আসব করেও শেষ পর্যন্ত এলো না। কয়লা-কাটা লোকগুলিই ও-রকম। ওদের কাজই আর ফুরুতে চায় না।

দুলাল কিছুটা স্বস্তি পায়। মেসো আসে নি, ভালোই হয়েছে। উনি এলে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হত। শুধাল, আপনি একা একা চলে এলেন? ভয় করে না?

—ভয়! ও মা ভয় কি! চিনিমাসির চোখ দুটো কেমন ঝকঝক করে ওঠে।

—না মানে, আসানসোল তো আর এখানে না, আজকাল যা দিনকাল পড়েছে, পথে কত কিছু হতে পারে।

—কি হতে পারে ?

ভারতী এবার তাড়া লাগায়, তোমরা বাপু ভেতরে এসো না। ও ঘরে চলো। ভারতী স্যুটকেস নিয়ে এগিয়ে গেল।

চিনিমাসিকে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে। উনি যে ভয় পাওয়ার পাত্রী নন, তা দেখলেই বোঝা যায়। বোকার মতোই যেন প্রশ্নটা করে ফেলেছে দুলাল। কিন্তু এখন আর পিছিয়ে আসারও উপায় নেই।

চিনিমাসি বললেন, এখন আর মেয়েরা অবলা জীব নয় দুলাল, সে যুগ চলে গেছে। পুরুষদের সঙ্গে এখন আমরাও টেক্কা দিয়ে চলতে পারি। বলেই একচোট হেসে নিলেন।

কথাটা কেমন যেন বুকের মধ্যে এসে বিঁধে গেল। মেয়েরা অবলা জীব নয়, তার মানে, আরতিও আর অবলা জীব নয়, তার মানে আরতিরও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে দুলালের।

সত্যি সত্যি চিনিমাসিকে অনেক আত্মনির্ভর মনে হচ্ছিল। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, গায়ে হাতকাটা ব্লাউজ, চোখে পাতলা রূপোলি ফ্রেমের চশমা। হাতে তখনো একটা নাইলনের ব্যাগ ঝুলছে। সেই ব্যাগে ভারী একটা তোয়ালে, রুটির প্যাকেট, চায়ের ফ্লাস্ক, কমলালেবু, জলের গ্লাস, চামচ আরো কিছু টুকিটাকি জিনিস দেখা যাচ্ছে। চিনিমাসিরা আসানসোল থেকে কয়েক মাইল ভিতরে কোম্পানির দেওয়া বাংলোয় থাকেন। বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে জায়গাটার নাকি তুলনা নেই। এর আগেরবার যখন দুলালের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল, তখনই উনি দুলালকে ওঁদের ওখানে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন। বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে দুলালের থাকলেও আজ অবধি সময় বা সুযোগ কিছুই হয়ে ওঠে নি।

মলিনাদেবী ডাকলেন, আয়, ভেতরে আয়। এসো দুলাল। তারপর

মাসির দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, কখন বেরিয়েছিস তোরা? বাথরুমে জল রয়েছে, চান করতে পারিস।

—না না, আমরা চানটান করে এক পেট খেয়ে বেরিয়েছি।

কথা বলতে বলতে ওরা ও ঘরে চলে গেলেন। দুলালের উঠতে ইচ্ছে করল না। কিছুই ভাল লাগছে না দুলালের। চিনিমাসি এসেছে তো ওর কী! ওর বুকের ভেতর থেকে অস্বস্তিটা তো কমিয়ে দিতে পারবে না চিনিমাসি, বরং কথায় কথায় আরো দশ রকম প্রসঙ্গ এসে পড়বে। কি বলতে কি বলে বসবে দুলাল, তারচে ভালয় ভালয় কেটে পড়াই ভালো। উত্তেজনায় উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল দুলাল, সরু গলিটাকে কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কেমন স্যাঁতসেঁতে। এরই মধ্যে বিকেলের বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। গলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বড় রাস্তার দিকে অফিস-ফেরতা মানুষের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। আর একটু পরে ট্রামেবাসে ওঠাই দুরূহ হয়ে উঠবে।

দুলাল আবার জানলা ছেড়ে সরে আসে। ও ঘরে বেশ হাসি ঠাট্টা শুরু হয়েছে। চড়া গলা পাওয়া যাচ্ছে বৃন্দাবনবাবুর। সবাই মিলে এক সঙ্গে যেন চেঁচাচ্ছে। দুলালের মনে হল, আরতিও এখন ও ঘরেই রয়েছে। ও ঘরে গিয়ে হাজির হলে আরতিকেও হয়তো দেখা যাবে। আরতির কথা মনে পড়াতেই দুলাল পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল। দরজার কাছাকাছি এসে একটু উঁকি দিল আর ঠিক এসময়ই বৃন্দাবনবাবুর চোখে ধরা পড়ে গেল দুলাল। আরে, তুমি ওখানে কি করছ? ভেতরে এসো।

দুলালের আর পালাবার পথ নেই। ফলে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢোকে দুলাল। ওপাশে খাট, নিচেও ঘরজোড়া বিছানা পাতা। নিচের বিছানায় বালিশে ঝুঁকে বসে আছেন বৃন্দাবনবাবু। খাটের এক কোণায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে আরতি। মুখটা এখনো কেমন ভার। ঘরের ওপাশে চিনিমাসি সুটকেস নিয়ে বসেছেন। যেন সুটকেসে কোন অমূল্য সম্পদ রয়েছে, তাই দেখাবার জন্য উনি সুটকেস খুলছেন। ভারতীর কোলে পুপু, কেমন হাঁ করে তাকিয়ে আছে বাচ্চাটা!

দুলাল ঘরে ঢুকতেই আরতি চট করে উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে যাবে নাকি, বসুক না! পাছে দুলালের চোখে চোখ পড়ে যায় এই ভয়েই যেন আরতি এদিকে তাকাচ্ছে না। বিরক্তিতে আবার গুটিয়ে যায় দুলাল।

—কি হল? বোস। এই আরতি, বসতে দে।

দুলাল নিরুপায় হয়ে খাটের একপাশে বসে পড়ল।

চিনিমাসি ততক্ষণে সুটকেস থেকে একটা মিষ্টির প্যাকেট বার করে এনেছেন। প্যাকেটটা আরতির হাতে উনি ধরিয়ে দিলেন।

—এগুলো আবার কি এনেছ ম্যাডাম? ওর বদলে তোমাদের ওখান থেকে কিছু কয়লা নিয়ে এলে পারতে! ওতে আমাদের উপকার হত।

ভারতী অস্বস্তিতে বিড়বিড় করে ওঠে, বাবাটা যে কী!

কিন্তু চিনিমাসিও দমবার পাত্র নন, হেসে বললেন, রোজ যে উনোন ধরান হয়, ওটা কাদের কয়লা শুনি? আসানসোলের কয়লা ছাড়া বুঝি গতি আছে আপনাদের?

বৃন্দাবনবাবু শক্ত মানুষ। অত তাড়াতাড়ি হার মানানো সোজা নয়। বললেন, ও কয়লা তো মেমসাহেবের হাতের ছোঁয়া থাকে না, তাই বলছিলাম আর কি! এরপর থেকে ওসব মিষ্টিফিষ্টির বদলে সুটকেসে কিছু কয়লা ভরে এনো, বুঝলে?

—ঠিক আছে, তাই হবে। আপনি যেদিন আমাদের ওখানে যাবেন, আপনার সুটকেসেই না হয় ক্লাস ওয়ান পিট ভরে দেব।

রান্নাঘরের দিক থেকে মলিনাদেবীর গলা পাওয়া গেল, চা নিয়ে যা খুকি, কি করছিস তোরা?

পুপুকে নামিয়ে রেখে ভারতী চা আনতে ছুটল, আরতিও মিষ্টির প্যাকেট হাতে বেরিয়ে গেল।

—তোমার মা ভালো আছেন তো দুলাল? চিন্ময়ী প্রশ্ন করল।

দুলাল মাথা নাড়ল, ভালো।

—তোমাদের বাড়ি করার কি হল? এখনো সেই বেড়ার পার্টিশন রেখেছ নাকি?

দুলাল বলল, এবার হাত দেব। আসলে নানা কাজে জড়িয়ে ওসব আর করাই হচ্ছে না।

—বাড়ি কর আর নাই কর, সিমেণ্টের দরখাস্তটা করে রাখলে পারতে। আসলে লোহালক্কর আর সিমেণ্ট এগুলি যদি কণ্ট্রোলে না যোগাড় করতে পার, তাহলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে। উপদেশ দিলেন বৃন্দাবনবাবু।

দুলাল সংক্ষেপে উত্তর দিল, করব।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ভারতী। নিন, হাতে হাতে তুলে নিন। কাপ সাজানো থালাটা এগিয়ে ধরল দুলালের দিকে। দুলাল একটা কাপ দু'আঙুলে তুলে নিল।

—মিষ্টি দিলি না? মিষ্টি দে।

—না না, আগে মিষ্টি কি! বৃন্দাবনবাবু বাধা দিলেন। আমরা আসানসোলের লোক নই যে আগে মিষ্টি খেয়ে মুখের বারোটা বাজিয়ে রাখব। দে, চা দে।

কিন্তু মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে মলিনাদেবীই হাজির। কই, হাত বাড়াও দেখি।

—জামাইকে অন্তত একটা প্লেটে দাও না দিদি। মুড়ি মিছরি সব এক দর করে ফেলছ।

মলিনাদেবী হাসলেন, আমার কাছে সবই সমান। কি বলো দুলাল?

দুলাল হুঁ হাঁ করল না। খেয়ে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। এ যেন একটা খাঁচার মধ্যে আটকে গেছে ও। ভেবেছিল, মিষ্টি বিলোতে অন্তত আরতিই ঢুকবে, কিন্তু আরতি ঘরে থেকে ইচ্ছে করেই সরে গেছে। ভীষণ বিশ্রী লাগে দুলালের। ইচ্ছে হল, যা থাকে কপালে এখনি একবার ছুটে গিয়ে আরতির সামনে দাঁড়ায়, কি ভেবেছ তুমি, অ্যাঁ?

কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে তুলাল।

বৃন্দাবনবাবু মিষ্টি নিলেন না, বরং তুলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কি হে, চা আর মিষ্টি একসঙ্গে খাচ্ছ, লোকে বাঙাল বলবে যে!

তুলাল গম্ভীর গলাতেই জবাব দিল, সবই তো পেটে যাবে। একটু আগে আর পরে।

—তা যা বলেছ। বাঙাল কি আর গায়ে লেখা থাকে। নিজের রসিকতায় এবার নিজেই হেসে উঠলেন বৃন্দাবনবাবু।

চিন্ময়ী বাধা দিল, আপনি বুঝি ঘটি?

ভারতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার কথা কেড়ে নিল, ও মা, তুমি জান না চিনিমাসি, বাবা যে মোহনবাগান।

তুলাল উঠে দাঁড়ায়। এবার শুরু হবে ঘটি আর বাঙাল। এদের কি, এরা তো আর বুবুদের চেহারা দেখে নি, এরা বুঝবে না।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, এই গোটা দেশটারই নাম মোহনবাগান করে দেওয়া উচিত। মোহনবাগান মানে জানিস, মোহনবাগান মানে ঐতিহ্য।

তুলাল পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই আরতিকে দেখতে পেল। রান্নাঘরের দাওয়ায় পা গুটিয়ে বসে আছে আরতি। তুলাল বুঝল, এই সুযোগ। রাতে থাকার কথাটা এখনি একবার বলে ফেলতে হবে। আরতির কাছাকাছি এগিয়ে এল তুলাল, কি হল? সবাই ঘরে, আর তুমি এখানে যে?

আরতি শীতল চোখে তাকাল। নিরুত্তর।

—কি হয়েছে? তুমি মাইরি—তোমাকে যে কী বলব!

আরতি চাপা গলায় বলল, আমার জন্য ভাবতে হবে না, আমি চিনিমাসির সঙ্গে চলে যাব।

—চলে যাবে? কোথায়? তুলাল যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আসানসোল।

—আসানসোল, কেন? একা যাবে?

—চিনিমাসির সঙ্গে গেলে একা হয় না। চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিল আরতি। দৃষ্টিটা কেমন ঝাঁঝালো।

দুলাল দ্রুত একবার ঘরের দিকে তাকাল, না, ঘরে খুবই হাসাহাসি হচ্ছে। কিন্তু কতক্ষণ হবে? হাতের সময় যেন ফুরিয়ে আসছে। এখনি যেন কেউ বেরিয়ে আসবে। দ্রুত বলার চেষ্টা করে দুলাল, তা হলে আমি কি করব, আমি?

আরতি আবার কঠিন গলায় উত্তর দেয়, সেটা তুমিই বুঝবে।

দুলাল আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, কী পাগলের মতো বকছ আরতি! আসানসোল কি এখানে?

আরতি চোখ নামায়, ওর চিবুকের কাছটা একটু বাঁকা হয়ে রয়েছে কী! ঠিক ধরতে পারে না দুলাল। আরতি কি ভাবছে! ওপাশে চোখ ফেরাল কেন! এই আরতি,—

আবার চোখ তোলে আরতি।

দুলাল এবার ক্ষোভে ফেটে পড়ল, না, তুমি যাবে না। কোথাও যেতে পারবে না তুমি।

আরতি জবাব দিল না। কিন্তু এমনভাবে তাকাল, যেন দুলালকে আর বিন্দুমাত্র পরোয়া করার কারণ নেই।

ভঙ্গিটা অসহ্য লাগে দুলালের। ইচ্ছে হচ্ছিল টুঁটি টিপে ধরে। কিন্তু না, সেটা সম্ভব নয়। ফলে, দুলাল গলা তুলে আদেশের ভঙ্গিতে বলল, আমি বলছি, তোমার যাওয়া হবে না।

গলার স্বরে চমকে ওঠে আরতি। তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়ায়, আমাকে বিরক্ত করো না বলছি, তুমি কেন এসেছ এখানে? কেন?

ততক্ষণে ও ঘর থেকে চিনিমাসি বেরিয়ে পড়েছেন। দুলাল নিজেকে সংযত করে চিনিমাসির দিকে তাকিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে। মাথার ভেতর ঝিমঝিম করছে। এক অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল দুলাল।

আরতি গম্ভীর মুখে বাথরুমের দিকে চলে গেল। চিনিমাসি এক পলক আরতির দিকে তাকালেন, কি হয়েছে?

দুলাল বিরক্তিতে উত্তর দিল, কি আবার হবে! একদম কথা শুনতে চায় না।

চিনিমাসি হাসলেন, ঝগড়া করছিলে বুঝি?

দুলালের মাথায় আবার রক্ত চড়ে গেল, ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। ওকে বলে দেবেন, আমি চলে যাচ্ছি।

—ওমা, এই পাগল, কোথায় যাচ্ছ? চিনিমাসিও কেমন যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

দুলাল বলল, আমি তো এখানে থাকতে আসি নি। এরপর আর বাসে উঠতে পারব না। তাছাড়া বাড়িতে মা একা রয়েছেন, চিন্তা করবেন।

চিনিমাসি কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঠিক এমনটি যে হবে উনি কল্পনায়ও আনতে পারেন নি।

দুলালও নিজের অভিমানটুকু আর দমিয়ে রাখতে পারল না। বলল, কাল অফিস ছুটির পর আবার না হয় আসব। আজ যাই, ওকে বলে দেবেন।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল দুলাল।

ততক্ষণে মলিনাদেবীও এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু দুলাল কোন দিকেই আর তাকায় না। রাগে অভিমানে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গলিতে নেমে সোজা এগোতে শুরু করে।

ঘাড়ে কপালে শিরাগুলি দপদপ করছে, যেন যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে পড়তে পারে। আরো কিছুক্ষণ ওই বাড়ির চৌহদ্দিতে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যেত ওর। বেলেঘাটাটা যে কোনদিন এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে কে ভেবেছিল! দুলাল টলে টলে এগোতে লাগল, ও ভালো করল না খারাপ করল, কে জানে!

॥ তের ॥

দুলাল বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়ির উচ্ছল ভাবটা দপ করে নিভে গেল। মলিনাদেবী সকাল থেকেই আরতির ভাব-সাব ভাল চোখে দেখছিলেন না। হঠাৎ দুলাল নাটক করে বেরিয়ে যেতেই আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। চিড়বিড় করে জ্বলে উঠলেন, অত রাগ ভালো নয় খুকি ! ছেলেটা কী এমন দোষ করেছে শুনি ! তুই যে ওকে তাড়িয়ে দিলি ?

আরতি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে সটান বড় ঘরে ঢুকে পড়ল। মা কী করে বুঝবে, কেন অমন ব্যবহার করল ! আরতির মতো মেয়ে বলেই এখনো ও এ-ঘর ও-ঘর করতে পারছে। অন্য কেউ হলে বোঝা যেত।

চিন্ময়ীও কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। বুঝতে পারছিল না কোথায় গলদ। খুকির সঙ্গে দুলালের ঝগড়া হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়, সব স্বামী-স্ত্রীরই ঝগড়া হয়, হতে পারে। কিন্তু চিন্ময়ী ভাবছিল অন্য কথা। ক' মাসই বা ওদের বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে ঝগড়া করার সময় পায় কী করে ওরা ! তবে কী ওদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়, তবে কী—

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখনই তোলা যায় না। তা ছাড়া জিজ্ঞেস করলেই যে খুকি গলগল করে সব কিছু বলতে শুরু করবে এমন নাও হতে পারে। চুপ করে থাকাই শ্রেয়। চিন্ময়ী চুপ করেই রইল।

শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবনবাবুর গলা পাওয়া গেল। কি হয়েছে রে ? দুলাল কি চলে গেল ? দুপদাপ পা ফেলে মলিনাদেবীও ঘরে ঢুকলেন, কি হয়েছে, তোমার মেয়েকেই জিজ্ঞেস কর না। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে একা একা তোমাদের মেয়ে কেন চলে এসেছে ?

—একা এসেছে! বৃন্দাবন যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তবে যে দুলালকে দেখলাম?

—দুলাল এসেছিল ওর খোঁজ করতে। ছেলেটা এসেছে, কথা বল, তা না, সারাদিন মুখটাকে হাঁড়ি করে রাখলি। দেখবি, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আরতি তবু নির্বিকার। সুখ দুঃখ সবই যেন ওর জানা হয়ে গেছে। সোজা গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল, ফিতে তুলে নিল, তারপর আবার বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। সামনের ঘরে এখন কেউ নেই, আরতি সামনের ঘরে এসে আয়না ছাড়াই চুল বাঁধতে বসে গেল।

—হয়েছে কি ওদের? বৃন্দাবনবাবু কেমন গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন, বাড়িতে যে এত সব কাণ্ড চলছে, বিন্দুমাত্র টের পান নি উনি। সব কেমন গোপন গোপন।

ভারতী পুপুকে নিয়ে পাশের বাড়ি গা ঢাকা দিতে চলে গেল। দিদি জামাইবাবুকে নিয়ে এখন দক্ষযজ্ঞ চলবে বাড়িতে। এর মধ্যে না থাকাই ভাল।

মলিনাদেবী আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, কি হয়েছে, খবর রাখতে পার না? মেয়েটাকে কোথায় বিয়ে দিয়েছ খবর রাখো না কেন? কেবল ষাঁড়ের মতো চেঁচালেই হয় না।

—কোথায় বিয়ে দিয়েছি! বৃন্দাবনবাবু যেন অদ্ভুত সব কথাবার্তা শুনছেন। দুলাল অকর্মা ছেলে নয়। তা ছাড়া সংসারে ঝামেলা নেই, নিজেদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইও আছে। গলদটা তাহলে কোথায় ধরতে পারছিলেন না উনি।

—ওর শাশুড়ীটা হচ্ছে ডাইনি। ছেলের বিয়ে দিয়েছে বলে যেন মাথা কিনে বসেছে।

—আহ্ কি হয়েছে বলবে তো? বৃন্দাবনবাবু রহস্য ধরবার চেষ্টা করছিলেন।

—দিনরাত মেয়েটাকে ঝি-চাকরের মতো খাটাবে, আর পান থেকে

চুন খসলেই মুণ্ডুপাত করবে। কেন, ছেলের বিয়ে না দিয়ে বাড়িতে ঝি রাখলেই তো পারত।

বৃন্দাবনবাবু তবু বুঝতে পারছিলেন না গোলমালটা কোথায়! ঘরের বউ সংসারের কাজ করবে তাতে দোষের কি! তবে এটা অবশ্য ঠিক, ওর শাশুড়ী একটু মুখরা। হতেই পারে। খুকিরও ওর মধ্যে বুঝে চলা উচিত। চেঁচিয়ে উঠলেন, খুকি, এই খুকি! বিয়ে দিয়েছি বলে তো আর মাথা বিকিয়ে বসি নি। আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। খুকি কোথায়?

মলিনাদেবী জানেন, লোকটার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। এখনই চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জড় করবে। থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, খুব হয়েছে, গাঁক গাঁক করে আর না চেঁচালেও চলবে। চেঁচানো ছাড়া কি জানো আর।

ঘরটা বড় অগোছাল হয়ে ছিল। কাপ-ডিশ কাপড়-চোপড় সেলাই মেসিন যত্রতত্র ছড়ানো। মেঝেতে ঘর-জোড়া একটা বিছানা পাতা। খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে মালিনাদেবী বললেন, না চেঁচিয়ে খাটে ওঠো, বিছানা তুলব। তারপর জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। ঝাঁটপাট দেওয়া দরকার। এসব কাজ বাড়িতে ধিঙ্গি মেয়ে থাকতে ওঁকেই করতে হয়। চারপাশে নজর না দিলেই সব ভণ্ডুল।

ওদিকে চিন্ময়ী ততক্ষণে পা টিপে টিপে আরতির কাছে এগিয়ে এসেছিল।

—দে, এদিকে দে, বেঁধে দিই।

আরতি নিরাসক্তভাবে একবার পিছন ফিরে তাকাল। চিরুনি এগিয়ে দিয়ে পিঠ পেতে বসে রইল।

চিন্ময়ী সস্নেহে চুলে চিরুনি ডোবাল, কি হয়েছে রে খুকি?

আরতি উত্তর দেবার আগেই ফুঁপিয়ে উঠল। আঁচল টেনে মুখের ওপর চেপে ধরল। হয়তো তখন থেকেই কান্নাটাকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল আরতি।

চিন্ময়ীর মনে হল, আরতির বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু কেন, কি জন্য এই যন্ত্রণা! চুলে চিরুনি টানতে ভুলে গেল চিন্ময়ী।

—এই, কি হয়েছে বল না? আমার কাছে না লুকিয়ে সব বলতে পারিস। এই—

আরতি এবার সশব্দে কেঁদে ওঠে। আঁচল দিয়ে চোখমুখ এক সঙ্গে চেপে ধরে। তারপর কান্নাটাকে গিলে নিয়ে গোঁজ হয়ে আবার বসে থাকে।

মুখটাকে টেনে তোলার চেষ্টা করল চিন্ময়ী, এই পাগলী, বোকার মতো কাঁদে কেবল।

আরতির নাক চোখ ভারী হয়ে উঠেছিল। নিজেকে সামলে নিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও। চিনিমাসি কি করে বুঝবেন ক'দিন ধরে কি ভীষণভাবে তছনছ হয়ে গেছে ও। যা ঘটেছে তা কি কখনো বলা সম্ভব। দুলালকেও তো সব কথা খুলে বলতে পারে নি আরতি।

—কি হল, বলবি না?

কান্নার আবেগটাকে ততক্ষণে টেনে ধরেছে আরতি। মুখ থেকে আঁচল সরাতে সরাতে বলল, কিছুই হয় নি। কি হবে আবার।

—কিছুই যদি না হবে, তবে অমন করছিস কেন? কাঁদছিস কেন?

আরতি আর একটুক্ষণ গুম হয়ে থাকে। তারপর বলে, তুমি কিন্তু এবার আমাকে আসানসোলে নিয়ে যাবে চিনিমাসি। আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

চিনিমাসি হাসলেন, যাবি তা আর বেশি কি! কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো?

আরতি বলল, আমার আর কলকাতা ভাল লাগছে না। এখানে থাকলে আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। কলকাতা আমার কাছে বিষ।

চিন্ময়ী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সামান্য কিছু অভিমান থেকে এ কথা বেরোয় না, নির্ঘাৎ আরো কিছু জটিল রহস্য রয়েছে পেছনে।

কিন্তু কি সেই রহস্য ! পুরোটা না শোনা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। বলল, কলকাতায় লোকে থাকার জন্য পাগল, আর তুই কি না—

—না, আমার আর কিচ্ছু ভাল লাগে না এখানে। তবু কলকাতায় যদি থাকতেই হয়, তা হলে তুমি দেখ, একদিন আমি গলায় দড়ি দিয়েছি।

—এই, দু'হাতে ওকে আঁকড়ে ধরে একটা ঝাঁকি দিল চিন্ময়ী। কী পাগল মেয়ের‌ে বাবা ! বিয়ের পর মানুষকে কত কিছু সহ্য করতে হয়, আর তুই কিনা !

—তুমি বুঝবে না চিনিমাসি, ওরা ইতর, ছোটলোক।

—কেন কি করেছে ? ছেলে হিসেবে দুলালকে কিন্তু আমার খারাপ লাগে না খুকি, সে তুই যাই বলিস।

—তুমি ওদের চেন না বলেই ও কথা বলছ।

চিন্ময়ী থমকে রইল। আরতির চুলের গভীরে চিরুনি ডোবাল, চুলগুলো কি করে রেখেছিস রে ? কতকাল চিরুনি দিস না ?

আরতি বলতে পারল না, কেন ওর চুলের এই অবস্থা। এ ক'টা দিন কী ভাবে যে কেটেছে ওর ! বুঝতে পারল, গোছা গোছা চুল উঠে আসছে চিরুনির সঙ্গে, চিরুনির টানে ঝনঝন করে উঠছে মাথাটা।

—তেল ছোঁয়াস না কেন ? চুল আছে, তাই এখন টের পাচ্ছিস না, যখন থাকবে না, তখন বুঝবি।

—আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না বল না, এর আগে তো কতবার তোমরা নিয়ে যাবার কথা বলেছ।

—যেতে তো আর আপত্তি নেই, কিন্তু বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে বেরুবি, সেটা কি ভাল দেখাবে ?

—ঝগড়া, ঝগড়া করব কেন ! আরতি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো চিনিমাসি। এখানে থাকলে সত্যি সত্যি আমি পাগল হয়ে যাব।

—তা যেতে চাস যাবি ! উদাসভাবে বলল চিন্ময়ী। কিন্তু কি হয়েছে আমাকে যদি বলতিস আমি বরফ গলিয়ে দিতাম।

আরতি আবার চুপ করে গেল। যেন আকাশ-পাতাল হাতড়াতে হাতড়াতেই আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল।

—কি হল ? বলবি না ? এই পাগলী ?

আরতি মাথা ঝাঁকাল, কি বলব ! আমি আসানসোল যাব, ব্যাস !

—শোন কথা, বললাম তো যাবি। কিন্তু ওরা কি করেছে বলবি তো ? কালই তো দুলাল আবার আসবে বলেছে। এই—

—বলেছি তো ওরা ইতর, ছোটলোক !

—এটা একটা উত্তর হল ? ছেলেমানুষি করিস না খুকি। কাউকে অত সহজে ইতর বলা ঠিক নয়। কত সময় কত ভুল বোঝাবুঝি হয়, আবার তা কেটেও যায়।

—ওরা বলে, আমি নাকি নোংরা মেয়ে। তোমাদের দুলালকে নাকি আবার বিয়ে দেবে। আমাকে ভয় দেখায়।

—সে আবার কী কথা ! কি করেছিস তুই ?

আরতি আবার নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে, দুলাল সম্পর্কে ওদের মোহ এখনি ভেঙে দেওয়া যেত, কিন্তু কি লাভ আর ওসব বকে।

—আবার বিয়ে দেবে কেন ? কে বলেছে ? শাশুড়ী ?

—ওরা যে ছোটলোকদের মতো বন্ধকী কারবার করে, জানতে তোমরা ? কত গরিবের সোনা-গয়না ওরা গিলে খেয়েছে তার শেষ নেই। আমার কাছে ওসব ব্যাপার গোপন করতে চেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে।

চিন্ময়ী অবশ্য বন্ধকী কারবারের জন্য তেমন কিছু অবাক হল না, কাজটা যে ভাল নয় তা সকলেই জানে, কিন্তু ওরই জন্য খুকি দুলালকে ত্যাগ করবে তা হতে পারে না। বিনুনি বুনতে বুনতে শুধোল, শাশুড়ীর সঙ্গে তোর লাগে কেন, তুই কথা শুনিস না নিশ্চয়ই।

আরতি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, আবার মুখ ফিরিয়ে নিল, আমার

ওসব ভালো লাগে না চিনিমাসি, ঠিক করে ফেলেছি, আমি আর ওখানে যাব না। তোমরা যদি জোর করে আমাকে পাঠাও, আমার মরা মুখ দেখতে পাবে।

চিন্ময়ী শুধোল, কি করবি তাহলে?

—বি. এ. পরীক্ষাটা এবার দিয়ে দেব। প্রাইভেটেই দেব।

—পরীক্ষা না হয় দিলি, পাসও করলি, তারপর?

—তারপর চাকরি করব।

—চাকরি এত সোজা?

—চেষ্টা করব। যে ভাবেই হোক একটা যোগাড় করে নেব।

চিন্ময়ী চুপ করে রইল। এমন কী ঘটেছে যাতে এতদূর অবধি ভাবতে পারে খুকি! এ কী সাময়িক উত্তেজনা, না আর কিছু!

—পাগলী! মাথাটাকে একদম তাতা কড়াই করে রেখেছিস! ঠিক আছে, তোর শাশুড়ীর সঙ্গে না হয় আমিই কথা বলব। কালই সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে যাব ওদের কাছে।

—তুমি ঠাট্টা করছ চিনিমাসি?

—এই দেখ, ঠাট্টা করব কেন? তোর শাশুড়ী যদি অন্যায় করে থাকে, কৈফিয়ত চাইব।

আরতির বুকের ভেতর গুড়গুড় করে ওঠে, না, তুমি যাবে না। আমাদের বাড়ি থেকে কেউ ওখানে যাবে না। ওদের সঙ্গে আমাদের আর সম্পর্ক নেই।

—তা কি হয়, আমরা মেয়েপক্ষ। মেয়েপক্ষকে অনেক সইতে হয়। তোর যখন ছেলেমেয়ে হবে, তাদের যখন বিয়ে দিবি, তখন বুঝবি।

আরতি আবার ছটফট করে ওঠে, বুবুদের হাতে যে ভয়াবহ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হল ওকে, তা বোধহয় প্রকাশ হয়ে পড়ার সময় হয়ে এসেছে। একমাত্র দুলাল ছাড়া ও ঘটনার কথা এখনো কেউ জানে না। কিন্তু ওর শাশুড়ী যেটুকু দেখেছেন, সেটুকুই তো বলতে পারেন। তোমাদের মেয়ে মাঝরাতে কেন সেদিন টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছিল?

কোথায় রাত কাটাতে গিয়েছিল তোমাদের মেয়ে ? কেন ওর গায়ের জামা অমন করে ছেঁড়া ছিল, কেন ওর শাড়িতে শায়ায় রক্ত শুকিয়েছিল, কি উত্তর দেবে আরতি ! কে বিশ্বাস করবে ওর উত্তর !

আরতি ঘামতে শুরু করে।

—আসলে বড্ড চটে আছিস তুই। সংসারে এত অস্থির হলে চলে কখনো ?

আরতি আঁচল দিয়ে মুখ মুছল, চটবার কারণ আছে, তাই চটেছি। যাক গে, আমি কিন্তু আসানসোল যাবই। তুমি আমাকে না নিয়ে গেলেও একদিন আমি গিয়ে হাজির হব। একা একা।

—না না, তুই আমার সঙ্গেই যাবি। চিন্ময়ী চিরুনি পরিষ্কার করতে করতে হাসল, কিন্তু ওদের তো একবার বলা দরকার।

—আমি বলেছি।

—কাকে বলেছিস ?

—যাকে বলা দরকার, তাকেই বলেছি।

সন্দেহের চোখে তাকাল, চিন্ময়ী, দুলালকে বলেছিস ? কি উত্তর দিল দুলাল ?

—আমি উত্তর শুনতে চাই নি, ওকে বলার ভাগ আমি বলেছি, ব্যাস।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল চিন্ময়ী। মেয়েটা যে এমন জেদি কে জানত ! সত্যি সত্যি এত জেদ ভাল নয়। শত হোক ও মেয়ে। কিন্তু চিন্ময়ীর কি দরকার ও সব নিয়ে অশান্তি বাড়ায়। বলল, ঠিক আছে, ওঠ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল দুলাল আসবে বলেছে, যদি আসে, তোর সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করব।

আরতি আর কথা বাড়াল না। বাড়িয়ে লাভ নেই। কাপুরুষটা কাল হয়তো সত্যি সত্যি আবার আসবে। আসুক, গ্রাহ্য করবে না আরতি।

॥ চোদ্দ ॥

অনেক রাত অবধি বিছানায় শুয়ে ছটফট করল আরতি। ঘুম আসছে না। গতকালও সারাটা রাত নির্ঘুম কেটেছে ওর। ঘুমোবার উপায় নেই। বালিশে মাথা রাখলেই কেমন এক অস্থিরতা ওকে চেপে ধরে। দম বন্ধ হয়ে আসে।

দু' একবার বিছানা ছেড়ে ও উঠে পড়ল। নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে জল ছিটিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু অসংখ্য হিজিবিজি চিন্তাজটে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ঘাড় গলা। কপালের পাশে টিপটিপ করছে যন্ত্রণা। এপাশ ওপাশ করেও স্বস্তি পেল না আরতি।

একটু চোখ বুজলেই মনে হয়, বহুদূর থেকে সমস্ত আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যেন একটা দ্রুতগামী ট্রেন ছুটে আসছে। আর আরতির পিঠের নিচে এখনো সেই হিমশীতল নিরেট রেল লাইনটা গুমগুম করে কাঁপছে। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না আরতি। এখনি উঠে না বসলে সেই যন্ত্রদানবটা ওর বুকের ওপর দিয়েই হা হা করে ছুটে যাবে। আরতি লাফিয়ে উঠে বসে। বসেই মুহূর্তের মাঝে বুঝতে পারে, ভুল। সবই মনের ভুল ওর। অসভ্য জানোয়ারগুলি ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ঐ রেল লাইনের ওপর। সে ঘটনা আবার ঘটবে কি করে।

সেই তিনটি নারকীয় রাতের স্মৃতি জীবনে হয়তো কোনদিনই ভুলবে না আরতি। কিন্তু রাত্রি হলেই বার বার অমনভাবে ওই হিংস্র মুখগুলো ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেন! সেই জলের কুঁজো, সেই ঘুমের ট্যাবলেট, সেই হাতকাটা লোকটার অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি, চিবুকের কাছে কাটা কদর্য চেহারার সেই লোকটা, রাবণের মতো

ঝাঁকড়া চুলঅলা লম্বা হিলহিলে সেই লোকটা অমন করে এগিয়ে আসে কেন ! কি অন্যায় করেছে আরতি !

উহ্ ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে ও, তারপর ঘোলাটে অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

পাশেই শুয়েছে ভারতী। ঘুমিয়েও পড়েছে। ওদিকে চিনিমাসি আর পুপু। কত নিশ্চিন্তে ওরা ঘুমুতে পারে। কত নিশ্চিন্তে সংসার করে চিনিমাসি। অথচ আরতির জীবনটা এমন হয়ে গেল কেন ! কি পাপ করেছিল ও !

আবার চোখ বুজে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে ও। কিন্তু অসম্ভব, ঘুম আসবে না। স্নায়ুগুলি কিছুতেই বশ মানছে না। মিছেই ওর ঘুমোবার চেষ্টা।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে আবার ছটফট করে উঠে বসে আরতি। তারপর বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেবার চেষ্টা করে। না, সবাই ঘুমুচ্ছে। বড় নিশ্চিন্তে হিংসুটের মতো ঘুমুচ্ছে সবাই। আরতির জন্য কারো এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, সবাই যেন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

আরতির চোখে জল এসে যায়। একটা সাংঘাতিক ভূমিকম্প হোক না। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঘরের এই দেয়াল আর ছাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ুক। সমস্ত কলকাতাটা ভেঙে তছনছ হয়ে যাক। দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে সবাই মরে যাচ্ছে না কেন ! মরুক, মরুক, মরে যাক। হিংস্র ভঙ্গি করে আরতি।

পরমুহূর্তেই আবার কেমন যেন অদ্ভুত লাগে ওর। ছি ছি, এসব কী ভাবছে ও ! ভারতী তো ওরই বোন। ও ঘরে ওর বাবা শুয়ে আছে, ওরা কি দোষ করেছে যে ভূমিকম্প হবে ! না ভগবান, ভূমিকম্প যেন না হয়। আমাকে ক্ষমা করো ভগবান।

আরতি ঘর থেকে নিঃশব্দে চোরের মতো বেরিয়ে পড়ে। ঘরের গুমোটবদ্ধ পরিবেশ থেকে খানিকটা যেন মুক্তি পায় ও। সটান বাথরুমে

এসে আবার চোখে মুখে জল দেয়। তারপর বাথরুম থেকে বেরুবার কথা ভুলে যায়। একপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখন কটা বাজে কে জানে! সে দিনও ওকে যখন টানতে টানতে রেল লাইনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা, তখনও কত রাত ছিল জানত না আরতি। সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে কেমন এক আচ্ছন্ন ভাব জড়িয়ে ছিল। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছিল ওর। কোথায় ওকে নিয়ে চলেছে জানত না আরতি! ওর ক্ষতবিক্ষত দেহটার জন্য আর কোনরকম মায়াও ছিল না ওর। কিন্তু রেল লাইনের ওপর থেকে কাতরাতে কাতরাতে আরতি যখন কাটাপুকুরের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে এক পলক দাঁড়াল, তখন মনে হয়েছিল, আরতি বাঁচবে, আবার বেঁচে উঠবে আরতি। জীবনটাকে যেন নতুন করে আবার ফিরে পেয়েছিল ও।

আর সেই উত্তেজনাতেই বোধহয় অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে গিয়েছিল ও।

কিন্তু আরতিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ওর শাশুড়ী। আর ওই কাপুরুষটা জানতে চেয়েছিল কতটা অক্ষত রয়ে গেছে ও। যাচাই করতে চেয়েছিল ওকে! ছিঃ!

না, আরতি ভুল করে নি। কাটাপুকুর থেকে চলে এসে কোন ভুল করে নি আরতি। চিনিমাসি যদি ওকে আসানসোল নিয়ে যায় ও আসানসোলেই চলে যাবে। নিজের পায়ে নিজে কিভাবে দাঁড়াতে হয়, আরতি একবার দেখে নেবে।

শরীরটা শিরশির করে কেঁপে উঠল ওর। পেটের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল একবার। গলায় আঙুল দিয়ে একটু বমি করে নিলে বোধহয় কিছুটা শান্ত হতে পারে ও। কিন্তু না, আবার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল আরতি। তারপর বেরিয়ে এল বাথরুমের বাইরে।

এসেই চমকে উঠল, কে ও!

মাথার ভিতর চড়াৎ করে সাপের মতো একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। টলে উঠল আরতি। কে ও! সেই লোকটা না? চিবুকের কাছে কাটা,

চামড়া কুঁচকে যাওয়া সেই কুৎসিত মুখটা না! ও কেন! ও কী করে এল এখানে!

হাত পা অসার হয়ে এল আরতির। আবার এখনি যেন বড় রকমের কোন একটা দুর্বিপাক ঘটে যাবে। সেই গুমগুম করা রেল লাইনের ওপরকার শব্দটা আবার যেন ভিড় করে চারপাশ থেকে এসে ওকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হু হু করে একটা রেলগাড়ি যেন আরতির দিকেই ধাওয়া করে ছুটে আসছে। এখনি রেলগাড়ির চাকার নিচে কাটা পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আরতি।

এমন হচ্ছে কেন? আরতি ঝাপসা মূর্তিটার দিকে আবার চোখ পাতল। হ্যাঁ, ওই লোকটাই তো! অবিকল সেই ঘোলাটে ঘিনঘিন করা চোখ। সেই একই রঙের জামা আর ট্রাউজারস। সেই ঝুলে পড়া নোংরা হাতের আঙুল। লোকটা কেমন দেয়ালের গায়ে স্থির হয়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছে।

না, ভুল দেখছে না আরতি। স্পষ্ট লোকটাকে ও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু একা কেন! সেই হাত উড়ে যাওয়া ওর সঙ্গীটা কোথায়। সেই লম্বা ঝাঁকড়া চুলওলা শকুনটা, না ধারেকাছে আর কাউকেই দেখতে পেল না ও। তবে কি লোকটা একাই! অমন ঘিন-ঘিনে চোখে তাকিয়ে আছে কেন? আর কী চায় ওরা?

আরতি ঘরের খোলা দরজাটার দিকে তাকাল। এক ছুটে ঘরের ভিতর কি চলে যাওয়া যায় না! ঘরে ওরা ঘুমুচ্ছে। ওদের কি চিৎকার করে এখনি জাগিয়ে দেওয়া যায় না! কিন্তু না, হাত পা নাড়তে গিয়ে বুঝল, সব কিছুই কেমন ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। চিৎকার করে উঠতে গেল আরতি, মুখ দিয়ে এক আঁজলা নোনা জল উথলে উঠল। দেহটাকে আর ধরে রাখতে পারল না ও, মেঝের ওপর ভেঙেচুরে গড়িয়ে পড়ল। তারপর অদ্ভুত একটা প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতো গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে এক সময় ও স্থির হয়ে গেল।

ভোর হতে তখনো বেশ কিছুটা বাকি। ঘর থেকে মলিনাদেবী বেরিয়ে এসে প্রথম আবিষ্কার করলেন আরতিকে।

—ওমা, কী সর্বনাশ! এই খুকি, কি হয়েছে তোর?

চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলে নিলেন মলিনাদেবী। আধো ঘুমের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন বৃন্দাবনবাবু, চিন্ময়ী, ভারতী।

—কি? কি হয়েছে? মাঝ রাতে কারো চিৎকারে ওরকমভাবে ঘুম ভেঙে গেলে বুকের ভেতর ভীষণভাবে ঢিবঢিব করে। চিন্ময়ী নিজেকে সামাল দিতে পারছিল না। আরতির দিকে তাকিয়ে কেমন স্থবির হয়ে গেল। ভারতী শিশুর মতো ডুকরে উঠল। বৃন্দাবনবাবুই এগিয়ে এসে আরতিকে তুলে ধরলেন, কি হয়েছে? এই খুকি, খুকি?

না, জ্ঞান হারায় নি আরতি। ওর ঠোঁট নড়ছে, কিছু যেন বলতে চায়। কি বলতে চায়, এই, কি বলছিস?

মলিনাদেবী ওর মাথাটা তুলে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। কপালে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। এই, কি হয়েছে?

আরতি একটা আঙুল তুলে ধরে নির্জীবভাবে। দেয়ালের দিকে দেখায়। ওই, ওই যে!

—কি ওই যে? দেয়ালের দিকে চোখ পাতে সবাই, কি ওদিকে? কি? দেয়ালের দিকে দেয়াল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না কারো।

ততক্ষণে নিজেকে বেশ কিছুটা সামলে নিয়েছে চিন্ময়ী। এই খুকি, কিছু দেখেছিস?

আরতির গলা আরো ক্ষীণ হয়ে আসে। ধীরে ধীরে চোখ বোজে আরতি।

চিন্ময়ী বলল, নির্ঘাৎ কিছু দেখে ভয় পেয়েছে। ওকে ঘরে নিয়ে চলো দিদি। ইস, বমিও করেছে বোধহয়! জামা কাপড় সব পালটে দিতে হবে।

বৃন্দাবনবাবু ছটফট করতে করতে বললেন, আমি কি বেরুব? হেম ডাক্তারকে ডেকে আনব?

মলিনাদেবী হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারলেন না। এ অবস্থায় কী যে করা উচিত কিছুই বুঝতে পারছিলেন না উনি।

বৃন্দাবনবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। ঘরে ঢুকে গায়ে জামা গলিয়ে নিতে নিতে বললেন, ভারতী, দরজা বন্ধ করে যা, আমি এখনি ডেকে আনছি ডাক্তারকে।

আরতিকে পাঁজাকোলা করে ঘরের ভিতর নিয়ে এল সবাই। চিন্ময়ী ঘড়ির দিকে তাকাল, রাত তিনটে। ভারতীর দিকে তাকাল, আমার মনে হয় নির্ঘাৎ কিছু দেখেটেখে ভয় পেয়েছে। এতই যদি ভয়, একা বেরুন কেন? আমাদের ডাকলেও তো পারত!

ভারতীর চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল। দিদিটা যেন কী হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। অথচ বিয়ের আগে ও কত অন্যরকম ছিল। মাঝরাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে দিদিকেই প্রথমে ডাকত ভারতী। দিদিকে কক্ষনো এতটুকু ভয় পেতে দেখে নি ও, কিন্তু আজ এ কী হল! বাঁচবে তো দিদি! বুকের ভেতর কেমন কাঁপতে থাকে ভারতীর।

মলিনাদেবী আগলে বসে রইলেন আরতিকে। জামা কাপড় পালটে দিয়ে ঘরের বাইরে বাথরুমে বালতিতে ভিজিয়ে রেখে এলেন।

চিন্ময়ী ওর গলায় আর ঘাড়ে হালকা করে কিছুটা পাউডার বুলিয়ে দিল। বমির গন্ধটা হয়তো এবার চাপা পড়ে যেতে পারে। তারপর আরতির মুখের কাছে মুখ এনে শুধোল, এই, বমি করেছিস কেন? গোপন করিস না কিছু, এই খুলে বল দেখি।

আরতি একবার মাসির মুখের দিকে তাকাল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, ঘুম আসছে না চিনিমাসি, কত দিন ধরে যে চেষ্টা করছি অথচ একটু ক্ষণের জন্যও ঘুমুতে পারছি না। উফ্—

—ওমা, ও আবার কি কথা, তুই ঘুমুস নি আজ? সারারাত জেগে ছিলি?

আরতি আবার দরজার দিকে তাকাল, একটু মাথা তুলে কিছু যেন দেখবার চেষ্টা করল।

—কি চাইছিস ? মা প্রশ্ন করলেন।

আরতি চোখ ফেরাল, চলে গেছে ?

—কে ? কে চলে গেছে ?

—বারে, সেই লোকটা যে—বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল আরতি। নিজেকে যেন ফিরে পেল ও। তবে কি লোকটাকে ওরা দেখে নি ! তবে কি আরতি যা দেখেছে সেটা ওরই চোখের ভুল ! নইলে তখন আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়ার পরও কারো কোন বিকার নেই কেন। অদ্ভূত লাগে আরতির।

—কোন লোকটা ? আগ্রহে ঝুঁকে পড়ল চিন্ময়ী।

সত্যি সত্যি কেউ এসেছিল নাকি ! ভারতীর গা কেমন ছমছম করে ওঠে।

আরতি এবার প্রায় স্থবির হয়ে গেল। বেশি কিছু বলতে ভয় হয়, এখনি যেন সেই তিনরাত্রির গোপন সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। মুখ বুজে থাকা ছাড়া উপায় নেই আর।

চিন্ময়ী আবার প্রশ্ন করে, কোন লোকটা ?

আরতি কথা ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে উঠল, ক'দিন ধরে এক ফোঁটা ঘুমই নি চিনিমাসি, একদম ঘুমুতে পারছি না। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল আবার।

চিন্ময়ী তাকিয়ে রইল। সব কিছুই কেমন জটিল রহস্যময়।

আরতি যে বিকারের ঘোরে ভুল কিছু দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন হল কেন ! ওর পাশটিতে বসে পড়ল, চা খাবি ?

আরতি হুঁ-না কোন উত্তর করল না। মুখে আঁচল চেপে ধরে রাখল।

—যাও না দিদি, একটু গরম চা খেলে হয়তো ওর ভাল লাগবে। তারপর ডাক্তার এসে যা বলেন করা যাবে।

মলিনাদেবীকে আঙুল দিয়ে ঠেললেন চিন্ময়ী। ভাবখানা এরকম যেন মা বসে আছে বলেই আরতি এখন সব কথা হয়তো বলতে পারছে না।

মলিনাদেবী উঠে পড়লেন। কিন্তু উঠেই আবার থমকে দাঁড়ালেন, দুধ নেই। প্রতিদিন ছ'টার মধ্যে গোয়ালা এসে দুধ দিলে চা হয়।

চিন্ময়ী বলল, লেবু নেই ? লেবু চা-ই করে দাও না ? সকালে লেবু চা-ই ভাল।

মলিনাদেবী বেরিয়ে গেলেন। ভারতী তখনো খাটের একপাশে বসে। চিন্ময়ী একবার ভারতীর দিকে তাকায়, তারপর আবার ঝুঁকে আসে আরতির দিকে, এই খুকি এখনো সময় আছে আমাকে বল ! কি হয়েছে বল না ?

আরতির দৃষ্টি কেমন ফ্যাকাশে। কিছু শুনতে পেল কি না কে জানে !

—এই খুকি ! আবার আরতির চিবুক নেড়ে ওকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল চিন্ময়ী।

—কি বলব ?

—বমি করলি কেন ? এই, আমার চোখের দিকে তাকা দেখি !

ভারতীও খাট থেকে সরে গেল। যেন দিদিকে একান্তে কিছু বলার সুযোগ দিল।

আরতি বলল, আমাকে তুমি আসানসোলে নিয়ে চলো চিনিমাসি। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

চিন্ময়ী বুঝল, আরতি মুখ খুলবে না। এত সহজে ওর ভেতরকার কথা টেনে বার করা যাবে না। বলল, আমি তো যেতে বারণ করি নি তোকে, কিন্তু যা জানতে চাইছি, বলছিস না কেন ?

—তুমি আমাকে নিয়ে চল মাসি, আমি সব বলব। সব বলব তোমাকে !

হাঁ করে তাকিয়ে রইল চিন্ময়ী। আর এ সময় বাবার গলা পাওয়া গেল, ভারতী এই ভারতী, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

খাট থেকে নেমে দাঁড়াল চিন্ময়ী। ডাক্তারবাবুর ব্যাগ হাতে বাবা ঘরে ঢুকলেন। হেম ডাক্তার সটান এগিয়ে এলেন আরতির কাছে, কি হয়েছে ? আরতির একটা হাত টেনে নিয়ে মুঠোয় চেপে ধরলেন।

ভারতী একটা টুল এগিয়ে দিল বসবার জন্য।

—কি হয়েছে মা ? ডাক্তারবাবু আরতির চোখ দেখলেন, জিভ দেখলেন। কি কষ্ট বলো তো মা ?

আরতি তাকিয়ে রইল।

—ভয় পেয়েছিলে ?

আরতি উত্তর করল, হুঁ।

—কি ভয় ? কিছু দেখেছিলে ?

আরতি আবার উত্তর করল, হুঁ।

—কি দেখেছিলে ? হেম ডাক্তার প্রেসার দেখার যন্ত্র বার করলেন।

আরতি আর কথা বাড়াল না।

চিন্ময়ী বলল, রাতে উঠে একা একা বাথরুমে গিয়েছিল। মনে হয় কিছু দেখে ভয়-টয় পেয়েছে। বমিও করেছিল।

—বমি ! ডাক্তার আরতির দিকে তাকালেন, রাতে কি খেয়েছিলে? হজম হয় নি বোধহয়।

—তা ছাড়া সারারাত নাকি এক ফোঁটা ঘুমও হয় নি ওর। আমাদের কিছু বলেও নি, আমরা জানতেও পারি নি।

আরতি বলল, ঘুমের ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু। এক ফোঁটাও ঘুম নেই আমার।

প্রেসার স্বাভাবিক। হেম ডাক্তার বুক দেখলেন, পিঠ দেখলেন। না না, সব ঠিক। ভয়ের কিছু নেই। হেম ডাক্তার আবার আরতির নাড়ী টিপলেন। সব নর্মাল।

খুব চিন্তা-টিন্তা কর নাকি মা ? হাসলেন।

আরতির ফাঁকা মাথার মধ্যে আবার সেই গুম গুম করা নিরেট রেল লাইনের শব্দ। বহুদূর থেকে যেন একটা ট্রেন হা হা করে ছুটে আসছে। এখনি এগিয়ে এসে ওকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে চলে যাবে। কেমন অস্বস্তি হতে থাকে ওর। অসহায়ভাবে ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকে আরতি।

—কি হল, কি রকম কষ্ট হচ্ছে বলো দেখি। হেম ডাক্তার স্নেহের হাত রাখলেন ওর কপালে। তারপর ফিসফিস করে শুধোলেন, নোংরা হয়েছিলে কবে? কতদিন আগে? বল মা, লজ্জা কি, বল?

আরতির সারা গা আবার রিনরিন করে ওঠে। ট্রেনটা কি খুব কাছাকাছি এসে পড়ল! রেল লাইনের গুমগুম করা আওয়াজটা ভীষণভাবে যেন ওর রক্তের ভেতর ঢেউ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এরা কেউ তা বুঝতে পারছে না কেন? এরা কি কানে শোনে না কেউ!

চিন্ময়ী বলল, এই, বল না খুকি, ডাক্তারবাবু কি জানতে চাইছেন?

আরতি প্রায় চিৎকার করে উঠল, জানি না. জানি না, জানি না। তারপর খাট থেকে হঠাৎ ঝটকা মেরে লাফিয়ে উঠে বসল।

হেম ডাক্তারও কেমন হকচকিয়ে গেলেন। কি হল? শরীর খারাপ লাগছে মা, যন্ত্রণা হচ্ছে? আচ্ছা দেখি দেখি, ঠিক আছে কিচ্ছু বলতে হবে না; শুয়ে পড় তো মা। ভাল করে একটু ঘুম হলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

আরতিকে আবার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল।

—বিছানা থেকে একদম উঠতে দেবেন না ওকে। প্রচুর বিশ্রাম দরকার। খসখস করে প্রেসক্রিপসন লিখে দিলেন হেম ডাক্তার। দোকান খুললেই ওষুধ এনে ওকে খাইয়ে দিন। কোন ভয় নেই মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরতির মাথায় আর একবার হাত বুলিয়ে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

—কি দেখলেন ডাক্তারবাবু? চোখ ফেটে তখন উৎকণ্ঠা গড়াচ্ছে বৃন্দাবনবাবুর। চিন্ময়ীও ডাক্তারের পিছন পিছন খানিকটা এগিয়ে এল।

হেম ডাক্তার মৃদু একটু অভয় দেবার চেষ্টা করলেন, মনে তো হয় নার্ভ টেনসনে ভুগছে। একটু বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা, না হলে অন্য কিছু ভাবতে হবে।

—অন্য কিছু! ঠোঁটদুটো কেমন ফাঁক হয়ে যায় বৃন্দাবনবাবুর।

—না না, ভয়ের কিছু না। অত ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—ভাল হয়ে যাবে তো ডাক্তারবাবু? চিন্ময়ীর গলাটাও কেমন কেঁপে উঠল।

হেম ডাক্তার প্রশ্নটা ভাল করে শুনতে পেলেন কিনা কে জানে! ভিজিট গুনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

॥ পনের ॥

সারারাত দুলালও বিছানায় ছটফট করল। ফিকে একটু ঘুমের রেশ জড়িয়ে ধরে চোখ, আবার তা কেটে যায়। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে দুলাল। কোথায় যেন সব কিছু গুছিয়ে এনেও বেচাল হয়ে যাচ্ছে ওর। বুবুদের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে যে ও ফিরতে পারবে এ কথা কে ভেবেছিল! হ্যাঁ, আরতির জন্যই বেঁচেছে ও। শেষপর্যন্ত আরতিও যে ফিরে আসতে পারবে এ ঘটনা স্বপ্ন ছাড়া কী আর!

দুলাল আর আরতি দুজনেই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে কিন্তু দুজনে এত দূরের হয়ে গেল কী করে! কপালের লেখা এড়াবার নয় বলেই যেন এ সব ঘটল, কিন্তু চিরকালের মতো মন থেকে কি এগুলো মুছে ফেলা যায় না! কাপুরুষ বলো আর যাই বলো, এছাড়া আর পথই বা কি ছিল! প্রতিশোধ নেওয়ার কথা কিছুতেই ভাবতে পারে না দুলাল। প্রতিশোধ নিতে হলে তো পুলিসের কাছেই যেতে হত। আর তাইতে কি সে-দিনের ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যেত! অসম্ভব। বরং চারদিকে আরো জানাজানি হয়ে যেত সব। সবাই আঙুল তুলে দেখিয়ে বলত, এই সেই দুলাল, তিন দিন তিন রাত গুণ্ডারা আটকে রেখেছিল ওর বউকে। তারপর যা নয় তাই বানিয়ে বানিয়ে বলতে শুরু করত সবাই। পরের বউয়ের নামে কেচ্ছা ছড়াতে কে না সুখ পায়।

অথচ আরতি এসব বোঝে না। বুঝতে চায় না। কেমন যেন ছন্দ-ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সব। সেই আগের মতো দিনগুলো বোধহয় কিছুতেই আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। আরতি কি সত্যি সত্যি সেই আগের মতো আর বাঁচতে চায় না !

আসানসোল যাওয়ার কথা শুনিয়ে দিল ও। সত্যি সত্যি কি চিনিমাসির সঙ্গে ও চলে যাবে ! আসানসোলে দুলাল সঙ্গে থাকবে না, অথচ সে জন্য কিছুমাত্র ওর কষ্ট হবে না। কথাটা ভাবতেই চড়াৎ করে ওর মাথার মধ্যে আবার একটা বজ্রপাত ঘটে গেল। সমস্ত শরীর ঝাঁজিয়ে উঠল। দুলাল দাঁতে দাঁত ঘষে আবার ছটফট করে উঠল।

অবশেষে আরতিকে শায়েস্তা করার একটাই পথ খুঁজে পেল দুলাল। স্রেফ নিজের গলাতেই একটা ব্লেড বসিয়ে দিলে কেমন হয়, আরতি এসে দেখুক, দেখে যাক, দুলালেরও দেহের ভেতরে ঘন লাল রক্ত রয়েছে। দুলাল মরে গেলে ও যদি স্বস্তি পায়, পাক।

কিন্তু না, মৃত্যুকে বড় ভয় পায় দুলাল। আবার গা শিরশির করে ওঠে ওর। মৃত্যুকে যদি ও পরোয়া না করত, তাহলেও বুবুদের গোটা দলটার বিরুদ্ধেই তো লড়ে আসতে পারত। তাহলে তো আরতিকে ওদের কাছে জামিন রাখার প্রশ্নই আসত না। তাহলে ঐ তিনটি রাতের নরক-যন্ত্রণাও ভুগতে হত না আরতিকে।

হ্যাঁ, স্বীকার করতে দোষ নেই, এসব ব্যাপারে বড্ড কাপুরুষ দুলাল। আবার নিজের সমর্থনে যুক্তি খোঁজার চেষ্টা করে ও। পুরুষ বা কাপুরুষে কী এসে যায় ! পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছে ও, যে ভাবেই হোক বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। একটু কেবল বুকের কাছে কেউ যদি ভালবাসার হাত বুলিয়ে দিত, দুলাল মান অপমান কিছুই গ্রাহ্য করত না। আর কিছুই চাইত না দুলাল। অপমানের কথা চিন্তা করলে বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কীইবা লাভ হয় মানুষের। আজ সারাটি দিন বেলেঘাটায় আরতি ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করল, তাতে অপমান ছাড়া আর কিছু ছিল কি ! দুলাল জানে, সারাটি দিন আজ

ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে ও। কিন্তু আরতির কাছে সব লাঞ্ছনা ও সইতে রাজী, সব অপমান। আরতি কেবল বুঝুক, তুলালের সব কিছু যে আরতিকে ঘিরে। আরতি কি তুলালের কান্না শুনতে পাচ্ছে না এখন! আরতি কি কিছুতেই বুঝবে না, তুলাল কত অসহায়! আরতি ওর জীবন থেকে সরে গেলে, আর কিছুই যে থাকবে না তুলালের।

মাথাটা আবার ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তুলালের। এখন রাত কত কে জানে। আজ আর ঘুম-টুম কিছুই আসবে না। পাশের ঘরে কত নিশ্চিন্তে মা এখন ঘুমিয়ে আছে। সংসারে এত কিছু ঘটে গেল, অথচ মা কত নির্বিকার। রাতের দিকে বাড়ি ফিরে আসার পর তুলাল ভেবেছিল মা হয়তো উৎকণ্ঠায় আরতির কথা জানতে চাইবে। সারাদিন হয়তো বাড়িতে বসে একা একা ছটফট করেছে মা, কিন্তু না, তেমন কিছুই চোখে পড়ে নি তুলালের। ভুলেও আরতির কথা জানতে চায় নি মা। একবারও জিজ্ঞেস করে নি, খোঁজ করেছিলি আরতির? একা একা চলে গেল, কোথায় গেল, খোঁজ নিয়েছিলি তো?

তুলাল জানে, জিজ্ঞেস করবে না মা। আরতি এখন মায়ের তু' চোখের বিষ। এখন যদি গাড়ির নিচে চাপা পড়ে মরার সংবাদ আসে আরতির, মা-ই সবচেয়ে খুশী হবে। হাড় জুড়োবে মায়ের। কিন্তু তু'দিন আগেও কি এমন ছিল! মা-ই তো কত দেখেশুনে আগ্রহ করে বিয়ে দিয়েছিল তুলালের। প্রথম দিকে আরতিকে কত আগলে আগলে রাখত মা। বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত পড়শিদের কাছে। অথচ সেই মা-ই আজ কেমন ভিন্ন মানুষ হয়ে গেল। সব কিছু কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এ ক'দিনে।

মাকে যদি সমস্ত ঘটনা খুলে বলা যেত, তাহলে হয়তো এমনটি হত না। কিন্তু অসম্ভব। গুণ্ডারা তিন রাত্তির আরতিকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল, এ-কথা কখনোই মুখে উচ্চারণ করা যায় না। মায়ের কানে কথাটা গেলেই ভিন্ন আর এক ঝামেলায় পড়ে যেত তুলাল। সারা পাড়া চেঁচিয়ে বলে আসত মা। আর তাতে ক্ষতি হত ওদেরই।

তাহলে কোন সাহসে আরতি আবার মুখ দেখাতে ফিরে আসবে এখানে! বরং এখনো যেটুকু ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে ওর তাও নষ্ট হয়ে যেত। না, দুলাল সেই জঘন্য ঘটনার কথা বলতে পারে না মাকে। বরং দিন কয়েক গেলেই হয়তো জেদ কেটে যাবে মায়ের। তখন গায়ে পড়েই আবার আরতির খোঁজ করবে মা।

দুলাল আবার পাশ ফিরল। কেমন একটা অভিমান যেন আঁকড়ে ধরছিল ওকে। আরতির ওপরই অভিমানটা যেন ঘন হয়ে উঠছিল। আরতিরও একটু বোঝা উচিত ছিল মাকে। এতদিন ধরে মায়ের সঙ্গে ও কাটাল, মাকে ওর না বোঝার কথা নয়। কিন্তু আরতিও কম জেদী নয়। ভীষণ একরোখা। সব মেয়েই বুঝি এরকম!

মাকে না হয় নাই চিনল আরতি, কিন্তু দুলালকেও কি ও চেনে না! নইলে জগদীশ মারা গেল, আর সেই ঘটনার পেছনে দুলালের হাত আছে ও ভাবল কী করে! দুলাল একটা মানুষকে খুন করতে পারে একথা ও বিশ্বাস করল কী করে! জগদীশ মারা যাওয়ায় সবচেয়ে যে অবাক হয়েছিল সে তো দুলালই।

আসলে এই কলোনিটাই হচ্ছে সর্বনাশের মূল। বড় বেশি করে এই কলোনির ওপর আস্থা রাখতে গিয়েছিল জগদীশ, বড় বেশি করে ওর পার্টি আর রাজনীতিকে এই কলোনির ওপর চাপাতে গিয়েছিল ও। সে দিক থেকে ভাবলে জগদীশের মৃত্যুর রাস্তা তো জগদীশই বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! এখন খেসারত দিতে হচ্ছে দুলালকে। সেই গুণ্ডারা আরতিকে নির্ঘাত বুঝিয়েছে, জগদীশের মৃত্যুর জন্য দুলালই দায়ী। দুলালই পুলিসের কাছে চুগলি করে এসেছে জগদীশের নামে। আর তাই পুলিসেরই ষড়যন্ত্রে খুন হয়েছে জগদীশ।

বুবুরা আরতিকে যা বোঝাবে, আরতি তা ধ্রুব বলে মেনে নেবে একথা ভাবতেই কেমন সারা গা রি রি করে ওঠে আবার। আরতি কেন একবার ভেবে দেখছে না যে, জগদীশের জন্য পুলিসের অত মাথা ব্যথা থাকবে কেন! কি অপরাধ ওর? জগদীশকে পুলিস সন্দেহ করতে পারে,

কিন্তু হর্স পাওয়ার ওকে নজরে নজরে রেখেও তো কিছু বার করতে পারে নি। দুলালও কত ভাবে লক্ষ্য করেছে জগদীশকে, কিন্তু কখনো তো মারাত্মক কিছু দেখে নি। তবে কেন খুন হল জগদীশ!

বরং জগদীশের মৃত্যুর জন্য দুঃখটা দুলালেরই বেশি। যেদিন মারা গেল জগদীশ, সেদিন কি দুলালকে দেখে নি আরতি! দুলাল কি সে দিন খুব আনন্দ করে বেরিয়েছিল! আরতি কি দেখে নি কি রকম সেদিন গুটিয়ে পড়েছিল দুলাল!

আসলে জগদীশের মৃত্যু রহস্যটা রহস্যই। দুলাল যদি জানতে পারত কারণটা, তাহলে তখনই ও চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে বলে বেড়াতে পারত, কে দায়ী! আরতিকে বুঝিয়ে দিতে পারত কারা দোষী! কিন্তু ওর মৃত্যুটা কেমন গোলোকধাঁধা। কিছুই বোঝার উপায় নেই। বুঝবার জন্য আর এগোতেও সাহস পায় নি দুলাল।

কিন্তু, দুলাল প্রতিশোধ নিক আর নাই নিক, আরতি ওদের কথাই বেদবাক্য হিসেবে মেনে নেবে কেন! বুবুদের কতটুকু জানে আরতি! দুলালই যাদের চেনে না, আরতি তাদের চিনে গেল কি ভাবে!

দুলাল বুবুদের মুখগুলি আবার মনে করার চেষ্টা করে। না, সে দিনের ঘটনার আগে আর কোনদিন ওদের দেখেছে বলে ও মনে করতে পারে না। ওদের নামও এর আগে কোন দিন শুনেছে বলে ওর মনে আসে না। শনিবারের সেই রাতেই দুলালের সঙ্গে ওদের প্রথম পরিচয়। অথচ দুলাল কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল, ছেলেগুলি ওর নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখে। দুলাল কি করে, কি খায়, কোথায় যায়, কখন যায়, সব খবর রাখে ওরা। রাখে বলেই অমনভাবে সে দিন ওকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছিল ওরা। ষড়যন্ত্র কিছু মাত্র আঁচ করতে পারে নি দুলাল। এখন ভাবতেও কেমন অবাক লাগে, ওর অগোচরে ওরই বিরুদ্ধে কত কিছু হয়ে যাচ্ছে চারদিকে। আগে থেকেই কত সাবধান থাকা উচিত ছিল ওর।

নাহ্, কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল দুলাল। রাত্রিটা কেমন দীর্ঘ থেকে

দীর্ঘতর হয়ে ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অথচ ঘুম নেই দুলালের। অসহ্য!

বাইরে বাড়ির কুকুরটাও হয়তো ঘুমুচ্ছে। পুকুরের ওপারে কবরখানাটা এখন কি রকম! বুবুরা কি সেই কবরখানার দিকে এগিয়ে এসে ঘোরাফেরা করছে এখন! ওরা কি দুলালের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে! কে জানে. থাকতেও পারে। দুল'লের অগোচরে এখনো যে কোথায় কি ঘটছে কে বলবে!

আবার পাশ ফেরে দুলাল, নাহ্, ঘুমুতেই হবে এবার। অনুমানে বুঝতে পারে, কালকের দিনটা হয়তো আরো খারাপ কাটবে ওর। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতেই হবে কাল। অফিসেও একবার যাবে দুলাল। না জানিয়ে এত দিন কামাই, না জানি চাকরিটাও দুলাল খুইয়ে বসেছে এত দিনে। হয়তো অফিসে গিয়ে দেখবে, ওরই টেবিলে নতুন একজন কেউ বসে মাথা গুঁজে হিসেব কষছে। ব্যস, তাহলেই পথে বসবে দুলাল।

বালিশে মুখ গোঁজে ও। আর এ সময় অত্যন্ত পরিচিত একটা স্নিগ্ধ গন্ধ ওর স্নায়ুর ভেতর পাক খেয়ে দুলে ওঠে। সমস্ত শরীর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে ওর। দুলাল চিনতে পারে এ গন্ধ আরতির। হয়তো আরতির বালিশটাকেই ও কাছে টেনে নিয়েছিল। হ্যাঁ, মাথা তুলে দেখল, আরতিরই বালিশ। আহ্, চুলের গন্ধে কী নিবিড় আপনজনের সুখ। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে দুলাল। তারপর আবার চোখমুখ পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয় বালিশে। চোখদুটো আপনা-আপনি ভিজে ওঠে ওর। হু হু করে কান্না উথলে ওঠে ওর দেহের ভিতরে।

॥ ষোল ॥

দিন আসে দিন যায়। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা দিন পার হয়ে গেল। এরই মধ্যে আরতির টুকটুকে ফর্সা মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে উঠল। চোখের নিচে কেউ যেন গভীর করে কালি বুলিয়ে দিয়েছে ওর। সেই ছটফটে স্বভাবটাও কেমন যেন মিইয়ে এসেছে। কেমন ধীর স্থির হয়ে গেছে আরতি।

অথচ রোগ বালাইয়ের কোন চিহ্ন খুঁজে পেলেন না হেম ডাক্তার। রোগ থাকলে তো ওষুধ দেবেন। অবশেষে আসানসোল নিয়ে যাবার কথা উঠলে হেম ডাক্তারও আগ্রহ দেখালেন, বললেন, এসব ক্ষেত্রে হাওয়া বদলে বেশ কাজ হয়। দেখুন না কয়েক দিন ঘুরিয়ে এনে।

আসানসোলেই নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করে ফেলা হল। আরতিও যাব যাব করছিল, চিন্ময়ীও রাজী হয়ে গেল। আসানসোলের নতুন পরিবেশে কিছু দিন কাটলে যে আবার খুকি ভাল হয়ে নিজেকে ফিরে পেতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

যাবার দিনক্ষণও স্থির হয়ে গেল। দুলালকেও জানান হল। দুলাল রোজই আসে, মুখ ভার করে খানিকক্ষণ বসে থাকে, তারপর চলে যায়। আরতির যাওয়ার কথা শুনে এবার আর আপত্তি করে নি দুলাল। আরতির যদি ভাল হয়, ও কেন আপত্তি করবে! বরং একবার ভেবেছিল ও যদি সঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু চাকরিটা তাহলে খোয়াতে হয়। অনেক কষ্টে, অনেক ঝামেলা করে আবার ও কাজে যোগ দিয়েছে, এখন ছুটি চাওয়া অসম্ভব। হাজার মন খারাপ হলেও দুলালের আপাতত এ-সব সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

স্টেশনে আরতি আর চিনিমাসিকে বিদায় জানাতে এসেছিল দুলাল। সারাক্ষণ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছটফট করল। আরতি তো কথা

বলাই বন্ধ করে দিয়েছে ওর সঙ্গে। চিনিমাসির সঙ্গেই এলোমেলো কিছুক্ষণ ও বকল। তারপর ট্রেনটা চলতে শুরু করলে দুলালও সঙ্গে সঙ্গে যতখানি পারল হাঁটল, দৌড়ল, চিঠি দেবেন কিন্তু চিনিমাসি। ওকেও লিখতে বলবেন। খুব দুশ্চিন্তায় থাকব কিন্তু—তারপর—হাত নাড়তে থাকল। তারপর অপার রহস্যের মতো ট্রেনটা চোখের বাইরে মিলিয়ে গেল এক সময়।

এরপর শুরু হল একটানা চাকার শব্দ। অদ্ভুত সেই শব্দটা শুনতে শুনতে সারাটা রাস্তা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল আরতি। বাইরে বিরাট আকাশের নিচে পৃথিবীটাকে কত বিশাল মনে হতে থাকে ওর। কলকাতা ছাড়ালেই কত রহস্যময় জগৎ ছড়িয়ে আছে। ভারি ভাল লাগতে থাকে আরতির।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মাথাটা আবার কেমন ভারি হয়ে উঠতে শুরু করে। মাথার ভেতর রেল লাইনের শব্দটা কেমন যেন হাতুড়ির ঘা বসাতে শুরু করে। আবার কেমন সারাটা গা ঝিমঝিম করতে থাকে আরতির।

শরীরটা বড় অল্পতেই আজকাল হাতের বাইরে চলে যায়। কেমন যেন এক শিথিলতা এসে ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে সারাক্ষণ। বড্ড ধীর হয়ে যায় আরতি। অথচ এককালে কত ছুটোছুটি করতে পারত ও। স্কুলের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। দীপা, মঞ্জু, মালা··· আরো কত নাম। কে জানে, কোথায় হারিয়ে গেছে ওরা। যে যেখানেই থাক, নিশ্চয়ই আরতির মতো জীবন নয় কারো।

জানলার দিকে মাথা এলিয়ে চোখ বোজে আরতি। হাত পা কেমন এক ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে থাকে যেন।

আরতির ভঙ্গিটা চিন্ময়ীরও চোখ এড়িয়ে যায় না। এই খুকি, ঘুমুচ্ছিস ?

আরতি চোখের পাতাদুটো আবার খুলে ধরে। ও পাশে পুপু কত শান্তভাবে বসে আছে। মুখখানা ভারি মিষ্টি লাগে ওর।

—কি হল রে ? চিন্ময়ী আলতো করে একটু ধাক্কা দেয় ওকে।

আরতি ঝিমোতে ঝিমোতেই উত্তর দেয়, কি হবে আবার ? কিছু না।

—তবে ও-রকম করছিস কেন ?

—কি করেছি ?

—অমন চমকে উঠছিস কেন ?

আরতি আবার স্থির হয়ে যায়। উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না আর। বাইরের বাতাসটা সত্যি সত্যি বড় ভাল লাগে ওর। আবার চোখ বোজে আরতি।

চিন্ময়ী কেমন শিঠিয়ে যায়। মেয়েটাকে নিয়ে এভাবে একা বেরুনটা উচিত হল কিনা কে জানে! নিজের বাপ মায়ের কাছে যত কিছুই ঘটুক, দোষ হয় না। কিন্তু আসানসোলে আবার যদি কিছু ঘটিয়ে বসে আরতি, চিন্ময়ীই দোষের ভাগী হয়ে থাকবে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগে চিন্ময়ীর। না জানি, সমীর ওকে কত কি গালাগালি করবে এ জন্য। যা বদরাগী মানুষ!

দুলালকে সঙ্গে টেনে আনলে কিছুটা হয়তো ভুল শোধরান যেত। নিদেন পক্ষে দিদিকেই সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল ওর। কিন্তু এখন আর সে সব ভেবে লাভ নেই। ট্রেনটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

অসহায়ভাবে চিন্ময়ীও জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। বাইরে ঝকঝকে আকাশ। হালকাভাবে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ছে। সাপের মতো ছুটে ছুটে যাচ্ছে টেলিগ্রাফের তার। কখনো বা দু-একটা দোয়েল সেই তারে বসে দোল খাচ্ছে। জগৎ সংসারে এত কিছু ঘটে অথচ পাখিগুলোর কিছুই যেন যায় আসে না।

বর্ধমান পেরিয়ে গেল ওরা। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালেই কত কোলাহল, কত ওঠানামা ব্যস্ততা। কত বিচিত্র সব মুখ, কত বিচিত্র সব কথাবার্তা। কিন্তু কোন কিছুই আর তেমন করে স্পর্শ করে না ওদের। গাড়ি থেকে নামতে পারলে এবার যেন বাঁচা যায়।

চুপ করেই বসে থাকে চিন্ময়ী। মাঝে মাঝে আরতির দিকে চোখ পড়ে, আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। কামরার বেশ কিছু যাত্রী দুর্গাপুরে নেমে গেল। এখন হাত পা ছড়িয়েও বসা যায়। কিন্তু আরতিকে নিয়েই কেমন এক দুর্ভাবনা মাথার মধ্যে যেন ঘুরপাক খেতে থাকে। চিন্ময়ী একটা হাই কেটে আবার আলতো করে ডাকে, খুকি?

আরতি ফিরে তাকায়। কি?

—নিজেকে যত গোপন করবি আরতি, ততই কষ্ট পাবি।

আরতি উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। আরতি জানে গোপন কথা খুলে প্রকাশ করলেও ওর কষ্ট কমবে না। কমবে তো নাই, বরং বাড়বে।

চিন্ময়ী আবার ফিসফিস করে প্রশ্ন করে, দুলালের কি কোন গোলমাল আছে খুকি? প্রশ্নটা করেই একবার চারপাশে তাকিয়ে নেয় চিন্ময়ী।

—কি গোলমাল? আরতি চমকে উঠেছিল।

—না মানে, তোদের তো বেশিদিন বিয়ে হয় নি। কত রকম গোলমাল থাকতে পারে।

আরতি আবার চুপ করে যায়। আবার বাইরের দিকে চোখ ফেরায় ও।

চিন্ময়ী আর একটু এগিয়ে বসে। আমাকে তুই ভেঙে বলতে পারিস আরতি। এই—

রেলের চাকাগুলো ছোট একটা ব্রিজ পেরুচ্ছে। শব্দটা যেন আবার আচ্ছন্ন করতে শুরু করে ওকে।

—এই, আবার ডাকে চিন্ময়ী।

আরতি আবার তাকায়, কি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না চিনিমাসি!

চিন্ময়ী কেমন থ' হয়ে থাকে। মিছেই ওকে প্রশ্ন করা। দাম্পত্য জীবন নিয়ে আর কিভাবে প্রশ্ন করা যায় কে জানে!

গাড়িটা আবার ধু ধু ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। কেমন রুক্ষ মাটি আর ঝোপ ঝাড় চোখে পড়ছে। কখনো বা দুটো একটা কোলিয়ারির চিহ্ন। এ মাটির সঙ্গে চিন্ময়ীর পরিচয় অনেক দিনের।

আরতিকে আর প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে চাইল না চিন্ময়ী। যা হবার তা হবেই। সমীর যদি স্টেশনে আসে সমীরের হাতে আরতিকে গছিয়ে দিয়ে রেহাই নিতে হবে।

বাকি রাস্তাটুকু কেমন থমথমে ভাবে কেটে গেল ওদের। অবশেষে চিন্ময়ীর সেই পরিচিত স্টেশন আসানসোলও এসে গেল। গাড়িটা প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সমীরকে খুঁজতে শুরু করল চিন্ময়ী। সমীরকে দেখতে পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেল।

—আয়, নেমে আয় খুকি। এসে গেছি।

মালপত্র নিয়ে নেমে পড়তে যেটুকু সময়, হনহন করে এগিয়ে এল সমীর। বেশ ভারিক্কী চেহারা, গায়ে পাখির ছাপ-মারা হালকা জামা, হাতে চেন সমেত একটা চাবির গোছা ঝুলছে। বেশ স্মার্ট, সুদর্শন।

—আরে খুকি যে! দুলাল কোথায়? আসে নি?

আরতি ঝুঁকে সমীরমেসোকে প্রণাম করল।

চিন্ময়ী বলল, আসবে কি করে, তোমারই মতো অফিস করে যে।

সমীর একটু সরলভাবে হেসে নিল, তা যা বলেছ, আগে অফিস, পরে না অন্য সব। সে যাক, খুব চাপ পড়েছে বুঝি কাজের। ছুটি পায় নি বুঝি? কি খুকুমণি ধরে আনতে পারলে না?

আরতিও মৃদু একটু হাসল, উত্তর দিল না। রেলের চাকার ঝিমঝিম শব্দটা এখনো যেন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে এলেও শব্দটা যেন ওকে ছেড়ে যাচ্ছে না।

—দুলালকে নিয়ে এলে কিন্তু কয়েকটা দিন বেশ হৈ হৈ করে কাটান যেত।

চিন্ময়ী শুধাল, গাড়ি এনেছো তো ? চলো, বেরুই আগে।

চারপাশে মানুষের গাদাগাদি ভিড়। আরতির চোখের সামনে মানুষগুলি যেন হুটোপাটি করে ছুটছে। আশ্চর্য ! স্টেশনে এলেই যেন মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। এই ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে কেমন দুর্বল লাগে আরতির। একটু দ্রুত হাঁটবার চেষ্টা করতে গিয়ে ওর মনে হয়, দেহটাই ওর বোঝা।

চিন্ময়ী সমীরের দিকে তাকায়, ইশারা করে, তুমি এগোও। ইশারার মাঝে কিছু একটা হয়তো বুঝিয়ে দিতে চাইল চিন্ময়ী। কিন্তু সমীরের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। হন হন করে কুলির সঙ্গে গেট পেরিয়ে পিছনে হাত তুলে ডাকল, তোমরা এসো. আমি মাল তুলে নিচ্ছি গাড়িতে। সমীরটা বরাবরই এ রকম।

সমীর এসেছিল অফিসের জিপ নিয়ে। নিজেই ড্রাইভার স্টেশন থেকে সাত-আট মাইলের পথ। এটুকু পথ একা ড্রাইভ করার পেছনে বেশ রোমাঞ্চ আছে, তাই আর ড্রাইভার-ফাইভারের খোঁজ করে নি ও।

স্টেশন থেকে কোলিয়ারির কলোনি পর্যন্ত এই রাস্তাটা চিন্ময়ীও ভুলতে পারে না। কোথায় যেন একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এই রাস্তাটার। দুপাশে কত সুন্দর সুন্দর সাঁওতালদের গাঁও। কোথাও কোথাও কোলিয়ারি, কোনটা জীবিত কোনটা মৃত। কোথাও আবার দিগন্ত জোড়া ধানের চাষ। কখনো বা সারা রাস্তা জুড়ে গরুর পাল শুয়ে থাকে। চারপাশটা কেমন যেন অলস, সারাদিন কেবল ঝিমোয়।

জিপের সামনের আসনগুলোতেই ওরা গাদাগাদি হয়ে বসে পড়ল। পুপুকে কোলের পাশে টেনে নিল সমীর। গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল।

—তারপর কি খবর বলো ? আমি যেতে পারি নি বলে বোধহয়—

চিন্ময়ী কথা কেড়ে নিল, দিদি জামাইবাবু খুব রাগ করেছেন তোমার ওপর।

সমীর গিয়ার ছাড়তে ছাড়তে একগাল হাসল, গাড়িটা চলতে শুরু করে। যাকগে, ভালো আছে তো সবাই ? তুমি দু' লাইনের যে চিঠিটা লিখেছিলে তা থেকে কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নেই। পুপুকে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর দেখিয়েছ তো ?

আরতি মাসি-মেসোর মাঝে কাঠ হয়ে বসে থাকে। রেল লাইনের সেই গুমগুম শব্দটা এখনো যেন ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে খোলামেলা বিরাট আকাশটা ওর চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কেন যে এমন হচ্ছে কে জানে।

চিন্ময়ী দাঁত চেপে উত্তর দিল, কে দেখাবে শুনি ? খুকির শরীরটা যদি ভাল থাকত, তাহলে এক কথা ছিল।

—কেন, কি হয়েছে ? আরতির দিকে চোখ ফেরাল সমীর।

—চিঠিটাও তুমি পড় নি। যাকগে, ওসব থাক. চলো এবার।

সমীর একটু গুটিয়ে গেল। শহর ছাড়িয়ে গাড়িটা এবার ফাঁকা মাঠের রাস্তা ধরেছে। রাস্তার ওপর কয়েকটা হাঁস উঠে এসেছে। সমীর তীক্ষ্ণ সুরে হর্ন বাজিয়ে ওগুলোকে তাড়াল।

—চিঠি পড়ি নি, কে বললে ? খুকুমণি কি যেন ভয়টয় পেয়েছিল লিখেছিলে ! কি হয়েছিল গো খুকুমণি ? আরতিকেই সরাসরি প্রশ্ন করল সমীর।

আরতি ম্লান একটু হাসবার চেষ্টা করে, কিছু না।

চিন্ময়ী দূরের দৃশ্যাবলীর দিকে চোখ পেতে রেখেছে। আর কার কি রকম লাগে এই রাস্তাটা কে জানে, কিন্তু চিন্ময়ীর যেন দেখে দেখে আশ মেটে না।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল চিন্ময়ী, ওই দেখ, ওই যে, ওই যে !

সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকায়. কি ?

চিন্ময়ী একটা ঝোপের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, শেয়াল, শেয়াল।

বেশি দূরে নয়, সামনেই রাস্তার ধারে একটা ডোবা মতো। তার

পাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝোপ। ঝোপের গায়ে সত্যি সত্যি একটা শেয়াল। জন্তুটা সড়সড় করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—দেখলি খুকি ? একদম কুকুরের মতো, লেজটা কেবল অন্যরকম।

আরতি ঝোপের দিকে তাকিয়ে স্থবির হয়ে থাকে। কেমন যেন আগ্রহ পায় না দেখার।

পুপুরই উৎসাহ বেশি। কিন্তু ঝোপের মধ্যে এখন শেয়াল খুঁজতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। জিপটা সমান স্পিডে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

বহু দূরে দূরে দুটো চারটে গ্রাম। গাছগাছালির সবুজ রংয়ে ঢাকা। কেমন শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট মনে হয়।

—গ্রামগুলি কি সুন্দর, না রে খুকি ? প্রশ্ন করে চিন্ময়ী।

আরতির একটা কিছু উত্তর দেওয়া উচিত, কিন্তু কেমন যেন স্থবিরতাই চেপে থাকে ওকে।

—ওসব গ্রামের যদি চাষী বউ হতে পারতাম তাহলে কি মজা হত, না রে ! ঠাট্টাটা অদ্ভুত শোনাল আরতির কানে।

সমীর বলল, এখনো তো সে সুযোগ রয়েই গেছে। যাও না। আমার তরফে কিন্তু কোন আপত্তি থাকবে না।

—ইস রে ! চিন্ময়ীর নাকের পাতা ফুলে ওঠে, তাহলে তো তোমাকে কোলিয়ারি ছেড়ে চাষবাস করতে হবে। রোজ লাঙল কাঁধে নিয়ে মাঠে যেতে হবে। গরু চরাতে হবে। পারবে ?

—তা যদি আজ্ঞা কর, তাই করব। এ আর কি কঠিন কাজ। সিগারেটের টুকরোটা টুক করে ছুঁড়ে দিল সমীর। গাড়িটার স্পিড আরো বাড়িয়ে দিল।

তারপর আবার হাসতে হাসতে বলল, এখন যে সব কাজ করি তার চেয়ে কিন্তু ও কাজ অনেক সোজা। তা ছাড়া রোজ মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে মাদল বাজাতাম, ধিতাং তানা, ধিতাং তানা—

মুখ দিয়ে মাদলের বোল তুলল সমীর। আবার হেসে উঠল প্রাণ খুলে।

আরতির মুখেও সামান্য একটু হাসি ফুটে উঠল। মেসো-মাসিরা সত্যি সত্যি ভাল আছে। কি নিশ্চিন্ত জীবন ওদের।

সমীর আবার আরতির দিকে তাকাল, সত্যি বলছি খুকুমণি, দুলালকে নিয়ে এলে খুব ভাল করতে। তিন নম্বর পিটে এখন দু হাজার ফিট নিচে কাজ হচ্ছে, খাদের নিচে নামলে দেখবে কী থ্রিল! কী মজা!

খাদে এর আগেও কয়েকবার নেমেছে চিন্ময়ী, কিন্তু বড় বাজে লাগে ওর ভেতরটা। তবু খুকি যদি নামতে চায় আর একবার না হয় নামা যাবে। কি খুকি, নামবি তো?

আরতি আবার ম্লান হয়ে যায়, কে জানে, মাটির নিচে হয়তো অনেক রহস্যই রয়ে গেছে। কিন্তু কোন রহস্যই যে আর ওকে তেমন করে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। তবু বলতে হয় বলেই যেন বলে, তুমি যদি নামো চিনিমাসি, তাহলে নামতে পারি!

সমীর বলল, তাছাড়া ক্লাবেও ওকে নিয়ে যেতে পার। খুব ভাল লাগবে ওর।

চিন্ময়ী চুপ করে থাকে। ক্লাবের পরিবেশের সঙ্গে খুকি কি খাপ খাওয়াতে পারবে। ওখানে মেপে মেপে কথা না বললেই বিপদ।

সমীর বলল, ভাল কথা, আমাদের মল্লিক এবার আমেরিকা যাবে। এতদিন পরে ওর আশা পূরণ হতে চলেছে।

চিন্ময়ী কেমন অবাক চোখে তাকায়, তাই নাকি! মল্লিকা ক্লাবে আসে না? ওর সঙ্গে তো তাহলে কথাই বলা যাবে না।

মল্লিকের স্ত্রীর নাম মল্লিকা রেখেছিল চিন্ময়ীরাই। মিসেস ভাদুড়ি এক কাঠি ওপরে গেলেন, সমীরের নাম রাখলেন চিন্ময়। ওঁর যুক্তি, মল্লিকের স্ত্রী যদি মল্লিকা হতে পারে তাহলে চিন্ময়ীর বর চিন্ময় হবে না কেন!

সমীর অবশ্য বিন্দুমাত্র আপত্তি করে নি এ নিয়ে। বেশ তো, মিসেসের গুণেই তো আমার গুণ। আজ থেকে না হয় আমি চিন্ময়ই হলাম।

জিপটা হু হু করে ছুটে চলেছিল। ফাঁকা রাস্তা। কখনো-সখনো দুজন একজন মানুষ চোখে পড়ে, কখনো আবার তাও না।

সমীর আর একটা সিগারেট ধরালো। আর দু-একটা বাঁক পেরুলেই ওদের কোলিয়ারিটা চোখে পড়বে। আজ আবার হাট-বার। কোলিয়ারির বাজারের কাছটা আজ জমজমাট থাকবে। হাট থেকে কয়েকটা মুরগী কিনতে হবে সমীরকে।

আরো খানিকটা এগিয়ে একটা টিলার ধারে ভাঙা মন্দির চোখে পড়ল আরতির। মন্দিরের গায়ে বট অশ্বত্থের জঙ্গল। ভাঙা মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার কেমন ঝিমঝিম করে শরীরটা। চোখ ফিরিয়ে নেয় ও।

চিন্ময়ী বলে, জানিস খুকি, এই মন্দিরে নাকি এককালে মানুষ বলি হত। এখন রাজাদের অবস্থা পড়ে গেছে। মন্দিরটাও তাই পোড়ো মন্দির হয়ে গেছে।

—মানুষ বলি হত! গাটা শিরশির করে ওঠে আরতির।

—সাঁওতালরা এই মন্দির নিয়ে অনেকরকম গল্প বলে, কোলিয়ারির পাশেই সাঁওতাল গাঁ আছে, ওখানে গেলেই সে সব গল্প শুনতে পাবি।

চুপ করে শুনে যায় আরতি। জ্বলন্ত সিগারেটটাকে আবার টোকা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সমীর।

—মংরু বুড়োকে ডেকে ওই মন্দিরের গল্প ওকে শুনিয়ে দিও। সমীর চিন্ময়ীর দিকে তাকায়।

আরতি মাথাটা এলিয়ে দিল পিছনের দিকে। এত গুমোট লাগছে কেন! চোখ বুজল। মাথার মধ্যে গুমগুম করা শব্দটা আবার যেন ওকে গ্রাস করে নিচ্ছে। ভীষণভাবে টলছে শরীরটা। এখনো বুঝি কোথাও না কোথাও মানুষ বলি হয়। কাঠগড়ায় গলা দিয়ে খিল আটকে দেয় ওরা। তারপর সেই বিকট শব্দ, দূর থেকে যেন ভীষণ জোরে শব্দ করতে করতে রেলের চাকা ছুটে আসে। তারপর—

—এই খুকি ! অমন করছিস কেন ? চিন্ময়ী ওকে আলতো করে একটু ধাক্কা দেয়।

সমীরও ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। কি হল ? কি হয়েছে ?

—গাড়ি থামাও, চেঁচিয়ে ওঠে চিন্ময়ী। গাড়ি রোকো।

ততক্ষণে এক আঁজলা নোনা জল উঠে আসে আরতির মুখে। তারপর কাতরাতে কাতরাতে খানিকটা বমিই করে ফেলে আরতি।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাইয়ী করে সমীর আর চিন্ময়ী।

আরতিকে ছু হাতে চেপে ধরে চিন্ময়ী বলে, চলো আগে, বাংলোয় নিয়ে চলো আগে। আমি জানতাম, এ মেয়ে আমাদের বেশ ভোগাবে। কি হল ? হাঁ করে দেখছ কি, চলো না !

॥ সতের

ভেতরে ভেতরে কেমন যেন ক্ষয়ে যেতে থাকে ছুলাল। অসহ্য এক মানসিক যন্ত্রণা। দিন সাতেক পার হয়ে গেল কিন্তু আসানসোল থেকে একটাও চিঠি এল না। আরতিরা আসানসোল যাওয়ার পর থেকেই যেন সমস্ত সম্পর্ক ছিড়ে গেছে। এমন হবে জানলে কিছুতেই যেতে দিত না ও। তবু কলকাতায় চোখের ওপর রাখতে পেরেছিল, কিন্তু এ কী নরক যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে গেল ছুলাল !

আরতি না হয় নাই লিখল, কিন্তু চিনিমাসি কেন চিঠি দিচ্ছেন না ! চিনিমাসি তো কথা দিয়েছিলেন, আসানসোলে গিয়েই চিঠি দেবেন। কি হতে পারে তাহলে !

তবে কি এই ক'দিনের মধ্যে আরতির কাছ থেকে আসল ঘটনাটা জেনে ফেলেছেন চিনিমাসি ! আর তাতেই কি ঘৃণায় চিঠি লেখার কথা ভুলে গেলেন ! কানের পাশে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে ছুলালের। কেমন যেন বুকের ভেতর ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। নিজেকে ভারি ছুর্বল লাগে ওর

আমাকে না হয় নাই লিখল, বেলেঘাটায় নিজের মা-বাবার কাছেও তো লিখতে পারে আরতি। ওরা ভালোভাবে পৌঁছেছে, ভাল আছে, এটুকু শুধু লিখলেই তো নিশ্চিন্ত হতে পারে দুলাল। কিন্তু—

তবে কি একবার বেলেঘাটা ঘুরে আসব! হয়তো এর মধ্যে কোন না কোন সংবাদ নির্ঘাৎ এসেছে ওখানে। মনটা ছটফট করে উঠল দুলালের। সরকারবাবুর কাছ থেকে ছুটি চেয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। একগাদা ঝামেলার কাজ পড়েছিল অফিসে. ঝামেলা মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। কিন্তু পুরোপুরি সন্ধ্যে না নামতেই শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ল দুলাল।

কিন্তু বেলেঘাটা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাতটা বেজে গেল। গলিটা কেমন থমথমে হয়ে ছিল আজও। বারবার এই গলিতে ঢুকলেই প্রথম দিনকার সেই স্মৃতিটা মনে পড়ে যায় দুলালের। সেই থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে কিছু না জেনে দুলাল আর ওর মা আরতিকে দেখতে এসেছিল এ বাড়িতে। ভারি অদ্ভুত লাগে দুলালের সে দিনকার সেই কথাগুলো ভাবতে।

দরজাটা খোলাই ছিল। দুলাল দরজায় এসে দাঁড়াতেই এক অভাবনীয় ঘটনা। বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে এল ভারতী, পেয়েছি, পেয়েছি। মা, দেখে যাও, কে এসেছে।

—কি হল! কেমন বোকা হয়ে যায় দুলাল। কি হয়েছে?

—ইস রে, কিছুই যেন জানে না। নেকু আর কি!

ততক্ষণে মাও এসে হাজির। ওমা, দুলাল এসেছ, বোস। চিঠি পেয়েছ?

দুলালের বুকের ভেতর ধক করে আঘাত লাগে, কার চিঠি?

ভারতী আবার আক্রমণ করে দুলালকে, কার চিঠি, ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না যেন।

—আহা, তুই অমন করছিস কেন ভারতী। আগে বসতে দে। তুমি কি অফিস থেকে এলে? তোমার মা ভালো তো?

দুলাল ককিয়ে উঠল, কার চিঠি বলুন না? বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।

—আসানসোল থেকে চিঠি এসেছে, তোমার মাকেও চিঠি দিয়েছে বলে লিখেছে, পাও নি তোমরা?

—মার কাছে! কবে? কি লিখেছে?

ভারতী বলল, যা লিখেছে তা জানতে হলে আগে মিষ্টি আনুন, তারপর বলা হবে। তুমি কিছু বলো না তো মা। আগে মিষ্টি, তারপর কথা।

মাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ঘরের বাইরে বার করে দিল ভারতী।

দুলালের হাত পা কেমন অবশ হয়ে এল। অসহ্য গরমে শ্বাস চুপসে আসছে ওর। আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। টলতে টলতে সোফায় বসে পড়ল দুলাল।

—কি হল? বসলেন যে! মিষ্টি নিয়ে আসুন। যদি আসানসোলের কথা জানতে চান, মিষ্টি নিয়ে আসুন আগে।

ভারতী কি যে বলছে কিছুই মাথায় ঢুকল না দুলালের। মনে হল, হিজিবিজি এক গাদা শব্দ যেন ওর মস্তিষ্কে সাপের মতো ছুটোছুটি করছে। কি লিখেছে আসানসোল থেকে! কি লিখতে পারে ওরা!

মাথাটা একটু এলিয়ে রেখে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করল দুলাল।

ভারতী ততক্ষণে ওর পাশটিতে বসে পড়েছিল। দুলালকে ধরে একটা ঝাঁকি দিল ভারতী, কি হল? ওরকম বোকার মতো তাকিয়ে আছেন কেন জামাইবাবু?

দুলাল ধীরে ধীরে বলল, একটু জল খাওয়াও না ভাই। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

ভারতী উঠে দাঁড়াল, ছেলের বাপ হতে যাচ্ছেন, এ কথা শুনেই এই। এরপর কি করবেন মশাই?

জল আনবার জন্য ভেতরে ঢুকল ভারতী।

ছেলের বাবা! দুলাল কেমন চমকে উঠল। তবে কি যা ভয় পেয়েছিল ও তাই-ই! তবে কি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল আরতি, আর তাই কি ও অমন হয়ে গিয়েছিল। নাহ্ অসম্ভব, হতেই পারে না! অসম্ভব!

ভারতী জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাহলে সত্যি বলছেন, চিঠি পান নি আপনি?

জলের গ্লাস এক নিমেষে চুমুক দিয়ে শেষ করে নিল দুলাল, মিথ্যে বলব কেন, চিঠি পাই নি বলেই তো জানতে চাইছি। তোমার দিদির কখন যে কী মর্জি হয় কি করে বুঝব!

—হ্যাঁ, সবই তো দিদির দোষ। আর আপনি কী গোবেচারা, সরল-সোজা মানুষ! যাকগে, মিষ্টি পাওনা রইল কিন্তু। চিনিমাসি লিখেছেন, আপনি এবার ফাদার অব এ চাইল্ড হবেন। গুড্ড্ গুড্ড্ ফাদার।

—অসম্ভব! চিৎকার করে উঠল দুলাল।

ভারতী কেমন থমকে গেল, কী অসম্ভব!

দুলাল আবার গুটিয়ে গেল। চিনিমাসি রসিকতা করেছেন। এ হতে পারে না।

—ওমা, রসিকতা করবেন কেন! ভারতী হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। কেমন একটা জটিল রহস্যের আঁচ পাচ্ছে যেন ও। ভারি মজাও লাগে ওর।

দুলাল উঠে দাঁড়ায়। এমন সময় ভেতর থেকে মলিনাদেবী ডাকলেন, চা নিয়ে যা ভারতী। শুনছিস?

ভারতী দুলালের দিকে তাকায়, ও কী, কোথায় যাচ্ছেন? উঠলেন যে?

দুলাল কথা বলে না। কথা বললেই যেন ওর ভেতরকার সমস্ত অস্বস্তিটা গলগল করে বেরিয়ে পড়বে। আবার বসে পড়ল দুলাল।

ভারতী কেমন যেন স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল দুলালের দিকে। কেন জামাইবাবু? রসিকতা বলছেন কেন?

মলিনাদেবীই চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকলেন। চা-টা খেয়ে নাও দুলাল। পরে লুচি ভেজে দিচ্ছি। কাপটা এগিয়ে দিলেন দুলালের দিকে।

দুলাল ইতস্তত করে কাপটা হাতে নিল। তাকিয়ে রইল।

মলিনাদেবী বললেন, খুকি নাকি পথেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস সমীর অফিসের গাড়ি নিয়ে এসেছিল। সমীর সঙ্গে না থাকলে খুকিকে নিয়ে চিনি খুব বিপদেই পড়ে যেত সেদিন।

দুলাল হ্যাঁ না কিছুই করল না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।

—সমীরের ওখানে অবশ্য কোম্পানির বড় হাসপাতাল আছে। ডাক্তাব-টাক্তারের অভাব নেই। এই যা ভরসা।

দুলাল চায়ের কাপটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল।

মলিনাদেবী বললেন, বুদ্ধি করে খুকিকে হাসপাতালেই নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হয় নি। এখন বাড়িতেই আছে, ভালো আছে। তোমাদের কাছেও তো চিঠি দিয়েছে বলে লিখেছে।

দুলালের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছিল। অসম্ভব, হতেই পারে না। কিন্তু অদৃশ্য একটা শক্তি ওর কণ্ঠনালী যেন দু হাতে সজোরে চেপে ধরেছিল। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল দুলাল।

মলিনাদেবী বললেন, তুমি একবার দু-এক দিনের জন্য ঘুরে এসো না ওখান থেকে। খুকি যদি আসতে চায়, ওকে নিয়েও আসতে পার।

দুলাল গলা ভারী করে জবাব দিল, না। যেখানে আছে সেখানেই থাক।

মলিনাদেবী কি বুঝলেন কে জানে, বললেন, তা অবশ্য ঠিক, ওখানকার পরিবেশ তো আলাদা, ওখানে কিছু দিন থাকলে ওর শরীর ভাল হবে। আমিও মনে করি এখন কিছুদিন ওর ওখানে থাকাই ভাল।

—চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে জামাইবাবু, খেয়ে নিন। ভারতী চায়ের কথা মনে করিয়ে দিল। দুলাল চমকে উঠে আবার চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল।

মলিনাদেবী বললেন, বোস, গল্প করো তোমরা। আমি জলখাবারটা করে দিই। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মলিনাদেবী।

এরপর আরো কিছুক্ষণ বেলেঘাটার ওই পরিবেশেই কাটিয়েছিল দুলাল। সারা শরীর জুড়ে কেমন এক অস্বস্তি। কিছুতেই অস্বস্তিটাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি ওর। অবশেষে একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে গলিটুকু পেরিয়ে আসতে সামান্য যা কিছু সময়। তারপর কলকাতার অগণিত জনসমুদ্রে মিশে গেল ও।

এলোপাথারি অনেকক্ষণ ভিড়ের রাস্তা ধরে হাঁটল দুলাল। কেমন উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। কখনো খুব দ্রুত পায়ে, আবার কখনো বা অত্যন্ত মন্থর। রাস্তায় এত ট্রামবাস গাড়িঘোড়া অথচ দুলালের কাছে সব কিছুই কেমন নিরর্থক। কি হবে তাড়াতাড়ি কাটাপুকুরে ফিরে! সেখানে সেই তো পুকুরের পারে ঝিম ধরে থাকে ওদের বাড়ি। পুকুরের ওপারে সেই কবরখানা। সেই একঘেয়ে পরিবেশ। বাড়ি ফিরলেই দেখা যাবে, প্রতিদিনকার মতো আজও খাবার আগলে বসে আছে মা। বিন-বিনে মশার সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাড়াতাড়ি যা পারে কিছু খেয়ে নিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়া সবই কেমন অর্থহীন মনে হয় দুলালের।

কিন্তু এইভাবে কতক্ষণই বা হাঁটা যায়! রাস্তায় পাগলের মতো হেঁটে বেড়ালেই যদি সমস্যা সমাধান হয়ে যেত, তাহলে এক কথা ছিল। দুলাল একটা বাস-স্টপের লোহার লাইনের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজে একবার জেনে নিতে পারলে হত। কিন্তু কাউকেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না। যত রাতই হোক কী আসে যায়! বুবুরা যদি আবার ওর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে

তুলে নিয়ে যায়! যেখানে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যাক। তুলাল নিজেকে যেন সমর্পণ করে দেবে এবার। ঠিক আছে, কোথায় যেতে হবে চলো। মাস খানেক পার হয়ে গেছে কবে, সত্যি সত্যি ও হর্স পাওয়ারের সঙ্গে কোন যোগাযোগই আর রাখে নি। থানার বড়বাবুর সঙ্গেও কোন দিন দেখা করতে যায় নি। তবু যদি ওকে সেই ছমছমে অন্ধকার আর নির্জন বাগান বাড়িটায় টেনে নিয়ে যায়!

তুলালের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত চলকে উঠল। সেই ভূতুড়ে বাড়িতেই তো ওর সর্বনাশ করে দিয়েছে ওরা। আরতিকে ওরা বন্ধক রেখেছিল ওখানেই। আরতিকে—

তুলাল আবার সেড ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। এখনো কি সেই নরক-কুণ্ডে শালারা রাত্রি জাগছে! আর কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে কি ওরা ওখানে মজলিশ বসিয়েছে আজও! কিছুই অসম্ভব নয়।

তুলালের হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল। পিস্তল বোমা নাই বা থাকল, এই খালি হাতেই একবার মুখোমুখি দাঁড়াব আজ। তুলালের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ায় আর কিই বা যুক্তি থাকতে পারে। মরতে যদি হয়ই, এবার শালা একটাকে নিয়েই মরব।

সারা গায়ে বুকে অসম্ভব শক্তি সঞ্চার হয় ওর। তুলাল প্রায় ছুটতেই শুরু করে। হঠাৎ হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে একটা বাসের। আবার বেশ করেকটা স্টপ পার হয়ে এসে নেমে পড়ে বাস থেকে। আবার ছোটে। গলি-ঘুঁজির ভেতর দিয়ে সর্টকাট খুঁজতে খুঁজতে এক সময় একটু শান্ত হয় তুলাল। কেমন খাঁ-খাঁ নির্জন হয়ে উঠেছে চারপাশে। কদাচিৎ তুটো-একটা লোক। তবে কি সেই রহস্যময় বাগান-বাড়িটার কাছেই চলে এসেছি!

তুলাল সন্দেহের চোখে চারপাশে তাকায়। হ্যাঁ, ওই তো ঝাপড়ান সব বড় বড় গাছ! ওই তো বাড়ির ওপাশে সেই আলকাতরার জলের মতো পুকুরটা! হ্যাঁ ওই বাড়িটাই তো!

কিন্তু থমথমে অন্ধকার ছাড়া কিছুই নেই। তুলাল ধীরে ধীরে

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। বুবুরা কেন, একটা রাত-জাগা কুকুরও চোখে পড়ল না। গাছগুলি কেমন নিঝুম হয়ে আছে। কে বলবে, এখানেই একদিন অত সব ঘটে গেছে।

সরে এল ছুলাল, সমস্ত শরীর ভেঙে কেমন অবসাদ নেমে এল ওর। ওপাশে পুকুরের পারে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আবার ধীরে ধীরে বাড়িটার চৌহদ্দি ছেড়ে বেরিয়ে এল।

কাটাপুকুরে নিজের বাড়ির সামনে যখন এল, তখন মধ্যরাত। সমস্ত কলোনিটা কেমন ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। ছুলাল কোন দিকে তাকাল না, দ্রুত পায়ে সটান নিজের বাড়ির সামনে চলে এল।

যা ভেবেছিল তাই, বাড়িতে ঢুকবার মুখেই দেখতে পেল, মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখেমুখে কেমন উৎকণ্ঠা। ছুলালকে দেখতে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন প্রীতিলতা।

—কি রে, এত রাত হল যে? কোথায় গিয়েছিলি?

ছুলাল উত্তর দিল না। উত্তর দেওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পেল না। মাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকে পড়ল।

—এত রাত অবধি তোর অফিস হয়? প্রীতিলতাও নাছোড়বান্দা। বললেন, খানিকক্ষণ আগে টিন কারখানায় একটা বাজার ঘণ্টা পড়ল, ছুশ্চিন্তায় বাঁচি না, মাগো—

ছুলাল গা থেকে খোলশ ছাড়ানর মতো জামাটা খুলে ফেলল। তারপর মায়ের দিকে না তাকিয়েই গামছা নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল। প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফেরার পর মার সঙ্গে কিছু না কিছু ওর কথা হয়ই, মা-ই পাড়ার কে কি করেছে না-করেছে, শোনাতে বসে। ছুলালের খোঁজে কেউ যদি এসে থাকে, তাও মার মুখেই এ সময় ও শুনতে পায়। কিন্তু আজ ছুলাল কথা বলার ক্ষমতাই যেন হারিয়ে বসেছে। তা ছাড়া কী লাভ এত কথা বলে! চারদিকে এত কথা, তবু যা হওয়ার তা তো হয়েই যায়। চোখের সামনেই তো সে সব দেখতে পেল ছুলাল।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে সটান রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল ও।

প্রীতিলতা ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন। বড় একটা কৌটোর ওপর হ্যারিকেনটা বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেই আলোয় মায়ের মুখটা বড় অদ্ভুত লাগল ওর। দুলাল চোখ ঘুরিয়ে নিল।

—অফিসেই ছিলি? না আর কোথাও গিয়েছিলি? প্রীতিলতা আবার প্রশ্ন করলেন।

দুলাল বুঝল, একটা উত্তর না দিলে মাকে থামান যাবে না। ফলে বলল, কাজ ছিল, তাই দেরি হয়েছে।

— কাজ ছিল! প্রীতিলতার চোখজোড়ায় তখনো সন্দেহ। কি এমন রাজকাজ করিস, ভেবে পাই না। তাছাড়া অতই যদি দেরি হবে, বলে যেতে পারিস না? আমি একা একটা মানুষ, বাড়ি আগলে পড়ে থাকি, ভয় করে না?

দুলাল চকিতে আর একবার মায়ের মুখখানা দেখে নিল। বলতে ইচ্ছে করল, কি ভয়? কার জন্য? কিন্তু কি হবে অত কথা বলে! ঘাড় গুঁজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু খেল, বেশিটাই ফেলে দিল। গলা দিয়ে কিছুই যেন নামতে চাইছে না আজ। এত বিস্বাদ হয়ে গেছে সব কিছু।

প্রীতিলতা দুলালের খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, ও কী ভাবে খাচ্ছিস তুই? ভাল করে খা।

দুলাল উঠে পড়ল। একটু আলাদা না থাকতে পারলে আর স্বস্তি নেই।

—কি হল, খেলি না? প্রীতিলতা দুলালের হাবভাব দেখে থমকে গেলেন।

দুলাল আবার পুকুর ঘাটে চলে গেল। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে আর কোন দিকে তাকাল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিল।

দিয়ে. স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘরটা অন্ধকার। ওপাশে টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটা রয়েছে, কিন্তু কে জ্বালায়! এখন

অন্ধকারটাই যেন ওকে কিছু স্বস্তি দিতে পারে। অন্ধকারটাই এখন ওর পরম বন্ধু।

পা মেপে মেপে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ও খাটটাকে ছুঁতে পারে। মশারিটা টানানোই আছে, ভেতরে ঢুকে চারপাশে গুঁজে দিতে যা সময়। কিন্তু না, নড়তে ইচ্ছে করল না ওর। অভিমানে বুকের ভেতরটা কেমন উথলে উঠতে শুরু করল।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ চমকে উঠল দুলাল, দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে মা। এখনো কথা শেষ হয় নি মায়ের। কত কথা

—দরজা খোল দুলু। কথা আছে।

মা বোধ হয় হ্যারিকেনটা সঙ্গে নিয়েই এসেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে একটু আলোর রেখা ছুরির ফলার মতো ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেল। দুলাল দরজা না খুলেই জানতে চাইল, কি কথা? আর কত কথা মা?

—দরজা খোল, তোর মাসি-শাশুড়ীর চিঠি এসেছে আসানসোল থেকে।

দুলালের হাত পা শিথিল হয়ে এল। চিঠি, সেই চিঠি! সেই দুঃসংবাদ!

কিন্তু এবার দরজা না খুলে পারল না দুলাল। দরজাটা খুলে ধরেই জিজ্ঞেস করল, কি লিখেছে?

—পড়ে দেখ, এই তো চিঠি। হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন প্রীতিলতা। চিঠিটা দুলালের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

নীল ইনল্যাণ্ড, চিঠির ঠিকানা দেখল দুলাল। মায়ের নামেই চিঠি। হ্যাঁ, আসানসোল থেকেই এসেছে।

কিন্তু চিঠিটা খুলতে সাহস হল না ওর। আবার প্রশ্ন করল, কি লিখেছে?

প্রীতিলতা বললেন, বউমা যে আসানসোল গেছে আমাকে বলবি তো?

গলার স্বরটা একটু অন্যরকম লাগল দুলালের। বউমা, অর্থাৎ আরতি! মা-ই তো ওর সঙ্গে কত দুর্ব্যবহার করেছে। মার জন্যই তো আরতি এ বাড়ি ছেড়ে বেলেঘাটায় চলে গিয়েছিল! কিন্তু আজ গলার স্বর এমন কেন!

দুলাল হ্যারিকেনের কাছে এগিয়ে এল। চিঠিটা খুলে ফেলে আলোর ওপর তুলে ধরল। তারপর আশ্চর্য, দেখল হিজিবিজি অক্ষরগুলি যেন ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে চিঠি থেকে। বার বার করে পড়ার চেষ্টা করল দুলাল, কিন্তু কেমন দুর্বোধ্য। কেমন হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে সব।

চিঠিটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে খাটে এসে শুয়ে পড়ে দুলাল। এ ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

—পড়লি? প্রীতিলতা দুলালের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন।

দুলাল বলল, তুমি যাও এখন, আমার ঘুম পাচ্ছে।

প্রীতিলতা আরো একটু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আরো কাছে এগিয়ে এলেন দুলালের, বউমার যে বাচ্চা হবে তা আমাকে বলবি তো! আমার কাছে সব কিছুই গোপন করে রাখার কোন মানে হয়! কোথায় এই সংবাদ আমিই বড় মুখ করে সবাইকে জানাব, তা নয়, আমাকেই চিঠি পেয়ে জানতে হল।

দুলাল গলায় কাঠিন্য এনে বলল, তুমি যাবে মা? বললাম তো আমার ঘুম পাচ্ছে।

প্রীতিলতা এগিয়ে এসে মশারিটা ফেলে দিতে দিতে বললেন, ঠিক আছে তুই ঘুমো। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারিস, বউমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় দেখি। এ সময় কোথায় কোন আসানসোলে গিয়ে পড়ে থাকবে, তা ঠিক নয়। ঘরের মঙ্গল-অমঙ্গল বলে একটা আছে।

প্রীতিলতা দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

আর দুলালের বুকের ভেতর হু-হু করে ককিয়ে উঠল এবার। সমস্ত শরীরটা যেন একই সঙ্গে ঝন ঝন করে কেঁদে উঠল চিৎকার করে।

দুলাল পাশ ফিরল, উপুড় হল, তারপর আবার উঠে বসল। ঘরের মধ্যে নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকারেই চিঠিটা খসখস করে উঠল হাতের মুঠোয়।

আবার দুলাল গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। চিঠিটাকে আরো জোরে চেপে ধরে অস্ফুট শব্দ করে উঠল, না, না, অসম্ভব! হতেই পারে না! সব মিথ্যে! অসম্ভব!

বালিশে মুখ গুঁজল দুলাল, তারপর অব্যক্ত যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে কাপুরুষের মতো কাঁদতে লাগল, অসম্ভব, হতে পারে না, হতে পারে না, অসম্ভব!

—